কালিদাসের 'অভিজ্ঞানং শকুন্তলম্' ও বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'

মোহাম্মদ আলি শেখ

'শকুন্তলা' গ্রন্থের বিজ্ঞাপন'-ভূমিকায় বিদ্যাসাগর বলেন, 'সংস্কৃত ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট নাটক 'অভিজ্ঞানং শকুন্তলম'-এর উপাখ্যানভাগ সংকলিত হইল।'[১] এবং পাঠকবৃন্দের নিকট নিজ 'সংকলন'এর পরিচয় দিতে গিয়ে বিনীত বচনে বলেন, 'আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।'[২]

বিদ্যাসাগরের এই বিনয় নিঃসন্দেহে মহত্ত্বপরিচায়ক। কিন্তু তাঁর 'শকুন্তলা' যে কেবলমাত্র সংকলন নয়, কালে তা প্রমানিত হয়েছে। অধিকন্তু যুগান্তরেও তাঁর অনূদিত শকুন্তলার রসাস্বাদন অনিঃশেষিত। সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস, আর শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠতম রচনা 'অভিজ্ঞতানং শকুন্তলম'-এর বঙ্গীয় রূপান্তরণে বিদ্যাসাগর ব্রতী। কিন্তু অনুবাদক হয়েও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর স্বাতন্ত্রিক। আমরা বলি, বাংলায় সংস্কৃত ভাষার কালিদাস কাম্য নয়; বরং কালিদাসের পরিপূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করেও যে অনুবাদের ভিতর নবাস্বাদন ও বৈচিত্র্যসম্পাদন তাই-ই বাংলায় আকাঙ্খা। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' অনুবাদ হয়েও অসংকায়িতভাবে সেই নবরস এবং বৈচিত্র্যে বিশিষ্টার্থক। তাঁর 'শকুন্তলা' একান্তই বাংলার শকুন্তলা আর এই 'শকুন্তলায় বাঙালী সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। সুতরাং কেবল অনুবাদ বলে বিদ্যাসাগরীয় 'শকুন্তল'ার সাহিত্যিক মূল্য এড়িয়ে যাওয়া দুস্কর।

শুনেছি, বিদ্যাসাগর বাল্যকালে বড় জেদী অবাধ্য এবং একগুঁয়ে ছিলেন। যে কার্য সবার কাছে নিষিদ্ধ তিনি তাই সাধন করতেন সর্বাগ্রে; বন্ধুবান্ধব, গুরুজন এমকি পিতৃদেবের আদেশ পর্যন্ত এক্ষেত্রে অলঙ্ঘনীয় ছিল না। সাহিত্য সমালোচকদের

মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, তাঁরা প্রায়শ 'অবাধ্যতা' গুণটিতে বড় গুণধর। দেখা যায়, বিদ্যাসাগরের সবিনয় প্রার্থনা তাঁদের অবাধ্যতাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেই চলেছে। তাই এই শকুন্তলা দেখিয়া, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলের উৎকর্ষ' পরীক্ষা করে দেখবার প্রলোভন তাঁরা কিছুতেই সংবরণ করতে সমর্থ হননি। এমনকি বিদ্যাসাগরকে নিয়ে যে ক্ষেত্রে সূঁচ চালনা করা বেশ কষ্টকর, সেখানেও তাঁরা বেতে কাটতে গিয়ে 'শকুন্তলার ভিতর বিদ্যাসাগর প্রতিভার বিস্ময়কর পরিচয় খুঁজে পেয়েছেন।

কালিদাস তাঁর অতুলনীয় কাব্য জগৎ থেকে যুগেযুগে প্যাক-ভারতীয় সাহিত্য-লোকে রহস্যালোক বিচ্ছুরণ করতে থাকুন, আমরা তাঁকে সম্মান জানাই। কিন্তু আমরা আমাদের বিদ্যাসাগরকে জানতে চাই—আত্ম-ইতিহাসের উৎসসন্ধানে, এ আমাদের এক মহান ব্রত। সংস্কৃতাভিজ্ঞ বিদ্যাসাগর কালিদাসকে কিরূপে আমাদের ঘর এবং মনের দোরে পৌঁছে দিলেন, তারই পরিচয় উদ্ঘাটনে আমরা বর্তমান আলোচনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে ক্ষেত্রে কালিদাসের মূল নাট্যজগতে প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের স্বল্প সামর্থ্যসত্ত্বেও আমরা কালিদাসের রাজ্যে প্রবেশের প্রয়াসের কসুর করবো না। এবং বিদ্যাসাগরী শকুন্তলার রচনামৃতের অভিনবত্ব আস্বাদনে আমাদের সহায়ক মহাকবি কালিদাস। সুতরাং 'বিজ্ঞাপনে' কথিত বিদ্যাসাগরী বিনয় বচন লঙ্ঘনজনিত অবাধ্যতাপরাধ অনিবার্য। সে ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের আদিস্থপতি এবং শিল্পী বিদ্যাসাগরের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিই আমার ভরসা। অনুসন্ধিৎসা যদি আলোকার্থী হয়, তবে কালিদাস এবং বিদ্যাসাগরের পাশাপাশি সামীক্ষণিক আলোচনা নিন্দনীয় হবে না বলেই আমার প্রত্যয় সুদৃঢ়।

প্রথম অংক: প্রথম পরিচ্ছেদ

'অভিজ্ঞানং শকুন্তলম্' এবং 'শকুন্তলা'র পর্যালোচনার প্রথম পর্যায়ে প্রথম অংক: প্রথম পরিচ্ছেদে আপনাদের দৃষ্টি কেন্দ্রিত। কালিদাসের প্রথম অংকের প্রারম্ভে আমরা একটি বিশেষ নাট্যীয় রীতির সাক্ষাৎ পাই। সংস্কৃত নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার এবং নটীর মাধ্যমে সূত্রাকারে নাটকের সংঘটিতব্য বিষয়ের ইংগিত এবং পরিচের কুশীলবগনের পরিচয় প্রদান করার রীতি মোটামুটি ভাবে 'প্রস্তাবনা' নামে অভিহিত। কালিদাসের প্রথমাংকে এ রীতি খুবই আকর্ষনীয়। 'যাসৃষ্টির স্রষ্টুরাদ্যা…৩ , শ্লোকটি দিয়ে নাটকীয় উপস্থাপন কৌশল শ্রোতৃ-দর্শকের কৌতুহল

তীব্রতর ক'রে তুলেছে। বস্তুতপক্ষে কোলাহল, বিক্ষিপ্তচিত্ততা নিয়ে সমুৎসুক দর্শক-চিত্ত নাটকের পর্দা উঠার পরই নাট্যীয় সংঘটনের প্রতি যখন উন্মুখ, তখন দর্শকের আগ্রহাতিশয্যের সুযোগ গ্রহণ ক'রে এক চমৎকার ভাবস্থির মূহূর্ত মহাকবি কালিদাস সৃষ্টি করেছেন এবং প্রস্তাবনার প্রয়োজনীয়তার অভ্রান্ততা প্রমাণ করেছেন।

বিদ্যাসাগরের অনুবাদকৃতি 'শকুন্তলা'র প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কোন প্রস্তাবনার ইংগিত পর্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। স্বতই আমাদের মনে প্রশ্নের দোলা লাগে যে, বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাবনা বর্জন কি নিহে'তুক?

এই প্রসঙ্গে 'শকুন্তলার' বিজ্ঞাপনের কথা অবার মনে পড়ে। বিজ্ঞাপন অংশে বিনয়ী বিদ্যাসাগর বলেন 'ভারতবর্ষেয় সর্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রনীত 'অভিজ্ঞানং শকুন্তল' সংস্কৃত ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। এই পুস্তকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যান ভাগ সংকলিত হইল।[8]

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সস্কৃত সাহিত্যের সাতসাগরের মাঝি বিদ্যাসাগর কালিদাসের অভিজ্ঞানং শকুন্তলের বিশ্বজোড়া খ্যাতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সজাগ। এবং এই অতুলনীয় নাটকের যথাযথ অনুবাদ-ও যে দুরূহ সে বিষয়েও তিনি অত্যন্ত সচেতন। তাই নিজের অনুবাদকে 'সংকলন' নাম দিতে তিনি কুণ্ঠিত নন। 'সংকলন' অংশে তিনি উপাখ্যানীয় বর্ণনাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাই ভাবসংকোচন না ক'রে সংক্ষিপ্ত করণ পদ্ধতি তাঁর অনুবাদে পরিগৃহীত। অর্থাৎ নাটকীয় কৌশল পরিহার ক'রে বর্ণনামূলক প্রণালীতে আপনার রচনাকে সীমাবদ্ধ করেছেন। তাঁর সম্মুখে অনুপস্থিত নয় ঘাতপ্রতিঘাত-রসতৃষ্ণ নাট্যকাব্যের দর্শক, বরং সেখানে কাহিনীভাগ শ্রবণের জন্য রয়েছেন অগণ্য শ্রোতা। সেখানে নাট্যীয় রীতিপ্রকৃতি বর্জনীয়, গ্রহণীয় কেবল মূল ঘটনার উপর আলোকপাতের এগিয়েচলা রসাল বর্ণনরীতি। বিদ্যাসাগর 'শকুন্তলা'য় কাহিনীভাগে ত্বরিত প্রবেশের জন্য সুত্রধর নটীর নাটকীয় উপস্থাপন প্রস্তাবনা বর্জন ক'রে পারিপার্শ্ব সচেতনত্ব, রীতি-সুনিতত্ব, এবং রসবোধের ঔচিত্যে শক্তিধর লেখকের বুদ্ধিমতার পরিচয় প্রদান করেছেন। বস্তুতপক্ষে অনুবাদক তদুপরি উপখ্যানকার বিদ্যাসাগর তাঁর সমগ্র শকুন্তলা'য় এখনি প্রয়োজনগত অজস্র বর্জনে নির্দ্বিধ।

কালিদাসে প্রস্তাবনা অংশ সমাপ্ত হবার অব্যবহিত পরেই বিদ্যুৎগতিতে নাটকের গতির সুষমা পাঠকের ঔৎসুক্যের সীমা চড়িয়ে দেয়। গতিশীল অশ্ববাহিত রথের ছবি পলকে নয়নপটে ভেসে উঠেই দূরে পালিয়ে যায়; পথও সে রথের পশ্চাতে যেন ছুটে চলে। ধাবন্তী মৃগীর উপর শরসন্ধানী দুষ্মন্তের চিত্র গতির সুষমায় মোহিত করে দর্শকের তৃষিত আঁখি! কালিদাস তাঁর নিপুণ তুলিকার নিপুণ আঁচড়ে নিখুঁত শব্দচিত্রে গতির মাধুরী ধরেছেন—

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানসিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়োর্ণসে
দূরে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপিন পার্শ্বে রথজবাৎ।[২]

[বাংলা তর্জমা— আলোয় এক্ষণি যাকে সূক্ষ্ম ব'লে মনে হয় সহসা তাই বিপুলায়তন লাভ করে! এইমাত্র যা বিযুত বলে বোধ হয়, মুহূর্তে তা সংযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়! প্রাকৃতিক যা বক্র, তা-ও আমার চোখে সরলরেখার মত প্রতিপন্ন হয়! রথ আমার কাছ থেকে কিছুমাত্র দূরে নয় মনে করতেই পলকে দেখি, আর আমার পাশে নেই!]

তপোবন প্রকৃতির শান্ততা, নির্হিংস তপশ্চর্যা—ইত্যাদির সঙ্গে গতির ভাবপরিস্ফুটনে কালিদাস মুক্তানিভ শ্লোটিতে বিস্ময়িত শক্তিসম্মোহন সৃষ্টি করেছেন।

অথচ কালিদাসীয় সূক্ষ্ম এবং তাৎপর্যপূর্ণ এই শ্লোক বিদ্যাসাগর অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যাগ করেছেন। বস্তু এবং বেগ একাকার করে কবি এবং নাট্যকার কালিদাস আমাদের চেতনার স্তরে এক স্নায়বীর শিহরণ জাগিয়েছেন। ভীতসন্ত্রস্ত, আর্ত প্রাণ-ভয়ে পলায়নপর মৃগীর ছুটন্ত ছবি এবং তার পিছনে হিংস্র শর-নিক্ষেপী দুষ্মন্তের রূপ চিত্তহারী। বিদ্যাসাগর তাঁর উপাখ্যানের পূর্বভাগে সংক্ষেপে হলেও যদি এই গতিময় অংশের দৃশ্যসজ্জা রচনা করতেন, তবে তাঁর শকুন্তলা'র নিঃসংশয়িত সৌন্দর্য বৃদ্ধি হ'ত।

কিন্তু বিদ্যাসাগর সংকলয়িতা হিসেবে শপথ খেয়ে কাহিনী আরম্ভ করলেন

অতিপরিচিত রূপকথা জাতীয় রচনার মত করে—'অতিপূর্বকালে ভারতবর্ষে দুষ্মন্ত নামে সম্রাট ছিলেন।'[৬] এবং নাটকীয়তার কণিকাটুকু পর্যন্ত বর্জন ক'রে সংবাদ পরিবেশন করলেন—

'একদিন, মৃগের অনুসন্ধানে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক হরিণ শিশুকে লক্ষ্য করিয়া রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। হরিণ শিশু তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণ ভয়ে দ্রুতবেগে পলাইতে আরম্ভ করিল।'[৭]

কাহিনীকার বিদ্যাসাগরের লক্ষ্য—'সংস্কৃতানভিজ্ঞ' পাঠকদের শকুন্তলার কাহিনী উপহার দেওয়া। প্রারম্ভিক অংশে আপাতত সেই সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট। সাহিত্য সৌন্দর্য মধুর নাট্টীয় অংশ বর্ণনাত্মক মন্থরগতি কাহিনীতে ধরতে বিদ্যাসাগর অনীহ; কালিদাসী অপূর্ব চিত্রময়তা এবং নাটকীয় উদ্বিগ্নতা এখানে বিদ্যাসাগরে অপ্রত্যাশ্য।

অতঃপর বিদ্যাসাগর কালিদাসের অনুসরণ প্রয়াসী ছুটন্ত মৃগীর উপর শরাঘাত-উদ্যত রাজাকে সন্ন্যাসী শরসংহরণ অনুরোধ জ্ঞাপন করা মাত্রেই দুষ্মন্ত উদ্ধতভাব পরিহার করলেন। আশ্রমমৃগীর পরিচয় পেয়ে লজ্জিত দুষ্মন্ত সন্ন্যাসীদের নিকট জ্ঞাত হলেন—এটি মহর্ষি কণ্বের আশ্রম। এবং ঋষিদের অনুরোধেই রাজা কণ্বাশ্রম পরিদর্শনের মানস করলেন।

বিনয়ী রাজা তপোবনের পবিত্রতা রক্ষা এবং ঋষিদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাজবেশ পরিত্যাগ করে বিনয়ীবেশে তপোবনে প্রবেশ করলেন।

তপোবনে প্রবিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাজার অন্তরলোকে কি এক অজানা অনুভূতির তোলপার শুরু হয়ে গেল। কালিদাসের বিস্মিত রাজা দেখলেন,

শান্তনিদমাশ্রমপদং স্ফূরতি-চ বাহুঃ কুতঃ ফলনিহাস্য
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র।[৮]

[বাংলা তর্জমা— শান্ত আশ্রমে আমার বাহুদুটি কম্পিত হচ্ছে কেন? এর ফলই বা কি? অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই খোলা থাকতে পারে বৈকি।]

বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব এই যে, তিনি কালিদাসকে স্মরণে রেখেই দুষ্মন্তকে করেছেন স্বাতন্ত্রিক। তপোবনে প্রবেশের সঙ্গে পুরুষের পক্ষে শুভসূচক দক্ষিণবাহুস্পন্দন কি ইংগিত বহন করছে? কালিদাস কেবলমাত্র বিস্ময়ের সীমনায় রাজাকে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর আরও স্পষ্ট ক'রে এবং দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দনের হেতু নির্দেশ ক'রে বলেন,

'রাজা তপোবনে পরিণয়সূচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই আশ্রমপদ শান্তরসাস্পদ, অথচ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে; ইদৃশস্থানে মাদৃশজনের এতদনুযায়ী ফললাভের সম্ভাবনা কোথায়? অথবা ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই হইতে পারে'[৯]

দেখা যাবে, অনুবাদের মূলভাব উভয়ত্র এক; অথচ ভাবকে বিস্তৃত এবং পরিণামী সংকের-মণ্ডিত রেখেই বিদ্যাসাগর ভাবকে অধিকতর পরিস্ফুট করেছেন। প্রথমত 'পরিণয়'-সূচক কথাটিতে বিদ্যাসাগর সমগ্র শকুন্তলা নাটককে চুম্বকের আকর্ষণ-বিন্দুতে ধরেছেন। অনুবাদক্ষেত্র পরিমিত সম্প্রসারণে মূলভাবের মাধুর্য হৃদয়মনোমুগ্ধকর। অনুবাদকের আপন হৃদয়োত্তাপে জরিত হয়েই আক্ষরিকতা বর্জনের ভিতর দিয়ে মূলের ভাবগৌরব এবং সৌন্দর্য যথার্থই বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতঃপর রাজার পরিণয়'ভাব আলোড়িত মন দেখতে পেল সমরূপ এবং সমবয়স্কা তরুমূলে জলসেচনরতা তিনটি তাপসকন্যা। রূপপিয়াসী দুষ্মন্ত সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হলেন। কালিদাস তাঁর স্বভাবসুলভ অব্যর্থ উপমায় চিত্রবদ্ধ করলেন রাজার প্রথম দেখা তিন তাপস কন্যাকে—

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রম বাসিনো যদি জনস্য দূরীকৃতা খলু
গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ[১০]

[বাংলা তর্জমা— রাজান্তঃ পুর দুর্লভ এই আশ্রমবাসিনী রূপবতী রমনীগণ। এদের দেখে আমার মনে হ'ল, যেন সৌন্দর্যগুণে সযত্নলালিত উদ্যানলতা অযত্নবর্দ্ধিত বন-লতিকার নিকট পরাজিত হয়েছে।]

বিদ্যাসাগর অনুবাদ করলেন—

'ইহারা আশ্রমবাসিনী ; ইহারা যে রূপে রূপবতী রমনী আমার অন্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, আজ উদ্যানলতা, সৌন্দর্যগুণে বনলতার নিকট পরাজিত হইল।[১২]

বিদ্যাসাগর এখানে মূলানুবর্তী ; মূলের স্বাভাবিক ভাবমাধুর্যকে তিনি মর্যাদার সঙ্গে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন। দুষ্মন্ত অতঃপর বৃক্ষবাটিকার অন্তরালে আত্ম-গোপন ক'রে তাপসকন্যাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। উৎকর্ণ দুষ্মন্ত-মনে অজস্রভাবের উদয়বিলয় কলিদাস ধরবার প্রয়াস পেয়েছেন। এবং তারুণ্যে মহাকবি দুষ্মন্তকে বাস্তব সংসারের প্রাকৃত নায়কের স্তরে নামিয়ে এনেছেন। তাপসকন্যাদের হাস্যপরিহাসময় রসালাপ শুনে রাজার তৃপ্তি মেটে না ; এবং তাদের 'প্রতি অঙ্গ লালি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'[১২] অবস্থায় রাজা উত্তেজিত। এই সময় রাজার আচরণে এবং কথায় মদনবাণবিদ্ধ যন্ত্রণা এবং অসঙ্গতির সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে। রাজার মুখে শোনা গেল—

অধরঃকিশলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহু
কুসুমিব লোভনীয়ং যৌবনঙ্গেষু সুংণদ্ধস ॥[১৩]

বিদ্যাসাগরের দুষ্মন্তও ঠিক অনুরূপ ভাবে আক্রান্ত 'শকুন্তলার অধরে নবপল্লব শোভার সম্পর্ণ আবির্ভাব ; বাহুযুগল কোমল বিটপের বিচিত্র শোভায় বিভূষিত ; আর নবযৌবন বিকশিত কুসুম রাশির ন্যায়, সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।'[১৪]

এখানে বিদ্যাসাগরীয় অনুবাদ কালিদাসের শ্লোকের সংরাগী। কিন্তু এই জাতীয় বর্ণনায় কালিদাস মদন শরাহত দুষ্মন্তের আকারবিকৃতি, স্বরবৈক্লব্য এবং ভাবান্তর বিদ্যাসাগরে অনুপস্থিত। দুষ্মন্তের মুখে কালিদাস যেখানে শকুন্তলার দেহ-লাবণ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে বিদ্যাসাগর অনেকটা নীরব। এমনকি শকুন্তলার পুষ্টোন্নত এবং উষ্ণস্তনের যেখানে বারংবার উল্লেখ করেও কালিদাসের দুষ্মন্তের আশ-মেটেনা, সেখানে বিদ্যাসাগরের দুষ্মন্ত একটিবারও 'স্তন' শব্দটি উচ্চারণ করলেন না! কালিদাসের অজস্র স্তনোল্লিখিত বর্ণনার একটি দৃষ্টান্তই আমাদের বক্তব্যের সমর্থনের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হ'তে পারে। যেমন—

স্রস্তাং সাবতিমাত্র লোহিততলৌ বাহূ ঘাটোৎক্ষেপণা
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্মাম্ভসাং জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকইস্তয়মিতাঃ পর্যাকুলা মূর্ধজাঃ।[১২]

[বাংলা তর্জমা— বার বার কলস উঠানো-নামানোতে শকুন্তলার শ্রান্তস্কন্ধের নীচে লম্বমান বাহুদুটির করতল লাল টকটকে হয়ে গেছে; অস্বাভাবিক এবং দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাসে স্তন দুটি কম্পমান; বিন্দু বিন্দু ঘর্ম-নিঃসরণে কর্ণের শোভমান শিরীষাভরণ পরিম্লান; বদ্ধবেণীর আজ বিস্রস্ত কেশ এক হাতে বাধাপ্রাপ্ত তবুও আলুলায়িত]

এ জাতীয় বর্ণনা বিদ্যাসাগর বেমালুম বর্জন করেছেন। শুচিস্নিগ্ধ, রুচিশীলিত বিদ্যাসাগরের মুক্ত মনের পক্ষে এমনটি সম্ভবপর হ'ল কি ক'রে? সংস্কৃত শাস্ত্রে স্তন অতি পবিত্র জিনিস; যার সঙ্গে মাতৃ-সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। তাছড়া বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে নারীমুক্তির অগ্রদূত। নারীর বন্দীত্বমোচন—তাঁর জীবনের এক মহানব্রত ছিল। নারীর সর্ববন্ধন মুক্তির স্বাপ্নিক মধুসূদনও বিদ্যাসাগরের মত নারীর প্রতি একটি শুচি-সুন্দর মনোভাব পোষণ করতেন, কিন্তু নারীর দেহরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে স্তন বর্ণনায় তিনি কদাচ দ্বিধাগ্রস্ত নন। অথচ কালিদাসের অনুগামী এবং নারীজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর নারীদেহ বর্ণনায় 'স্তন' শব্দের অনুল্লেখে কি প্রতীচ্যের রুচির সমর্থন করেছেন? আমরা জানি, সংস্কারবাদীর বাড়াবাড়ি তাঁর নিকট ঘৃণ্য; আবার সংরক্ষণশীলতার অন্ধতা তাঁর হস্তে নির্দ্বিধ আক্রান্ত। তবে কিহেতু বিদ্যাসাগর নারীর সৌন্দর্য বর্ণনাকালে বিশেষ সংস্থান-ঘটিত উপযুক্ত পরিস্থিতির অনিবার্যতার ভিতরও 'স্তন' বর্ণনায় মৌনাবলম্বণ করলেন?

কিন্তু প্রথম অংশে বিদ্যাসাগর সখীত্রয়ের মধুর সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন এই অংশে তিনি কালিদাসের অনুসরণ ক'রেও আপন স্বাতন্ত্র্যে স্রষ্টার লীলাবিলাস করেছেন। কালিদাসের শকুন্তলা প্রথমাংকে প্রাণ ভরপূর অথচ লাজনম্র সখীচালিত এবং মৃদু ভাষিনী ও মৃদুলহাসিনী। বিদ্যাসাগরে তদ্রূপ। কিন্তু বাঙালীর মেয়ের আবেগ এবং সহজতায় মধুর। 'শকুন্তলা' গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ চরিত্র শকুন্তলা যে একান্তই বিদ্যাসাগরের মানসদুহিতা, তা প্রথম অংকেই সংকেতিত। বাঙালী যুবতীর মার্দবহাস্য, হার্দবচতুর্য এবং আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গীতে শকুন্তলায় সূক্ষ্মস্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট। অপরপক্ষে

প্রিয়ংবদার লাস্যাচার কৌতুকময়তা, চাঞ্চল্য বিদ্যাসাগরে আরও সুন্দর। অনসূয়ার প্রশান্ততা, পরিণাম দৃষ্টি, বিবেচনা অতীব হৃদয়হারী। প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা বিদ্যা-সাগরের কৃতিত্বের জগতে এই তিন তপোবনতরুণীর নূতন পরিচয় পাব।

তিন সখীর তরুমূলে জল সেচনকালে বৃক্ষান্তরালে অবস্থানরত রাজার চরনবিরহদশা উপস্থিত করেছেন কালিদাস। এখন রাজার সঙ্গে শকুন্তলার পরিচয় অনিবার্য, অতএব মহাকবি মধুপ-অত্যাচার কল্পনা করলেন। শকুন্তলা মধুপ অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলে দুষ্মন্ত অছিলা পেয়ে সম্মুখে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমর হ'ল বিদূরিত। জলসেচন হ'ল বন্ধ। কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর পরিচয় পর্ব এল। রাজা নির্দ্বিধায় শকুন্তলার কথা জানতে চাইলেন। এবং শুনলেন সমস্তকাহিনী। কালিদাস কৌশিক-মেনকা বৃত্তান্ত সূতাকারে জানালেন। তাঁর অনসূয়া বসন্তকালে তপস্বীর তপস্যাভঙ্গের কথা বলবার পর লজ্জায় নীরব হয়েছেন। রাজা শুনলেন—

অনসূআ—তদো বসন্তোদারসমএ সে উন্মাদইত্তঅং রূবং পেক্খিঅ (অর্ধোক্তে লজ্জয়া বিরনতি)[১৬]

[বাংলা তর্জমা— অনসূয়া বললেন, তারপর বসন্ত উদয়ে তার (মেনকার) রূপ দেখে তিনি উন্মত্ত হয়ে (অর্ধপথে লজ্জায় থেমে গেলেন)]

কিন্তু বিদ্যাসাগরে কাহিনী বিস্তৃত রয়েছে। আসলে কালিদাস নাটকের ক্ষেত্রে অনেক ঘটনা এবং কাহিনী কেবল ইংগিতে জানিয়ে দিয়ে বাদবাকিটা পাঠকের বুদ্ধিবিবেচনার উপর ছেড়ে দেন। নাট্যকারের স্বল্পপরিসরে এ ছাড়া গত্যন্তরও থাকে না অনেক সময়। কিন্তু বিদ্যাসাগর উপাখ্যানীয় লেখক, তাঁর রয়েছে, বিস্তৃত বলবার সুযোগ। তদুপরি মানস-দুহিতা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে না বলে শান্তি পাচ্ছেন না তিনি। তাছাড়া পাঠকদের অবহিত করতে চান দুঃখিনী শকুন্তলার দুর্ভাগ্যের কথা। শকুন্তলা জন্মদুঃখিনীর মতই পরপালিত, পরাশ্রিত। তাঁর জন্ম-রহস্য কেবল কৌলীন্য পরিচায়ক নয় বরং তাঁর জীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রক-ও বটে। পিতা যার বিশ্বামিত্র, মাতা যার মেনকা, তার কেন এই দুর্ভাগ্য? মন্দভাগ্য শকুন্তলার প্রতি তার পিতামাতার নৃশংস আচরণকে ফুটিয়ে তুলে শকুন্তলার অসহায়ত্ব বিশ্বব্যাপ্ত করতে চান বিদ্যাসাগর। জন্মে শকুন্তলার কোন

দোষ নেই; সে নিষ্পাপ। কিন্তু নিষ্ঠুর সংসার তাকে জন্মের অপরাধে পাঠিয়ে দিয়েছিল নিষ্করুণ মৃত্যুর মুখে। করুণাপর কণ্বঋষি দিলেন স্নেহের আশ্রয়। শকুন্ত পাখী দুর্ভাগা শকুন্তলাকে জন্মের অব্যবহিত পরেই পক্ষাশ্রয়ে রেখেছিল বলে মা-বাপহারা শিশুর নাম হ'ল শকুন্তলা। মহাভারতের কাহিনীতে এ কাহিনীর কতদূর সমর্থন আছে, তা আমরা অবগত নই; কিন্তু কালিদাসে এ সবের কোন স্থান নেই। অথচ এই জন্মবৃত্তান্ত বলেই বিদ্যাসাগর তাঁর অন্তরের কারুণ্যধারা বইয়ে দিয়ে পাঠকের অন্তরে শকুন্তলার প্রতি সমবেদনা আকর্ষণ করেছেন। অবশ্য মূলকাহিনীর ভাব বিকৃতি ঘটেনি এতে; বরং মূলের স্বাভাবিকত্ব সুপরিস্ফুট হয়ে কাহিনী অংশে প্রাণ সঞ্চার করেছে।

এ-দিকে রাজার পরিচয় জানবার জন্যে শকুন্তলা মনে মনে উদগ্রীব হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আপাততঃ ভাবভঙ্গীতে যেন কিছুমাত্র কৌতুহলী নন, তা বোঝাতে গিয়েই ধরা পড়ছেন বেশী করে, কালিদাসের প্রিয়ংবদা রাজার ভাবভঙ্গী এবং আকৃতি দর্শনে রাজার পরিচয় সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন। বিজ্ঞার মত অনসূয়া রাজার পরিচয় জানতে চাইলেন। ততক্ষণে শকুন্তলার মনে পূর্বরাগের জ্বালাপোড়া শুরু হয়ে গেছে। কালিদাসের শকুন্তলা মনে মনে বলেন—

(আত্মগতম্) কিংনু কৃখু ইমং পেক্খিঅ তপোবন বিরহিণো বিআরসস গমনী অহ্যি সংবুত্তা।[১৭]

[বাংলা তর্জমা—কি আশ্চর্য! এই লোকটিকে দেখা অবধি আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হচ্ছে কেন?] এবং অনসূয়ার মুখে রাজপরিচয় জানার ঔৎসুক্য দেখে পরক্ষণেই আপনার অশান্ত মনকে প্রবোধ দিয়ে বলেন,

(আত্মগতম্) হিঅঅ, মা উত্তম্প, এসা তু-এ চিন্তিদং অনসূসা মন্তেদি।[১৮]

[বাংলা তর্জমা— হৃদয় অধীর হ'ও না। তুমি যা জানতে চাও এক্ষণি অনসূয়া তাই-ই জিজ্ঞাসা করছে।]

'বিদ্যাসাগরের "শকুন্তলা"য়—'শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই

অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া, আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় হইতেছে? এই বলিয়া তিনি, তাঁহার নাম, ধাম, জাতি ব্যবসায়াদির বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত উৎসুকা হইলেন।[১৯]

এখানে আমার পরমশ্রদ্ধাস্পদ গুরু অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং ডঃ আনিসুজ্জামান বিদ্যাসাগরের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য:

'তপোবনবিরুদ্ধ ভাব, কথাটির মধ্যে শকুন্তলার লজ্জাজনিত আবেগের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি আছে। মূলে দুষ্মন্তের পরিচয় সম্পর্কে শকুন্তলার ঔৎসুক্য ব্যক্ত করা হয়নি; প্রিয়ংবদার প্রশ্নের পর শকুন্তলার স্বগোক্তির সূত্র থেকে বিদ্যাসাগর তা নির্মাণ করেছেন। আখ্যানে এর প্রয়োজন ছিল।'[২০]

এখানে 'আখ্যানে এর প্রয়োজন ছিল' কথাটি মূল্যবান। বিদ্যাসাগর উপাখ্যান লেখক। সেখানে বর্ণনার তুলিকায় অনেক সংকেতকে বিস্তৃত করবার প্রশস্ত সুযোগ রয়েছে এবং ইংগিতকে সুস্ফুট করাই সেই প্রশস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার। তপোবন-শাসন, সংযম-সাধন, মনুষ্য সমাগমশূন্য প্রকৃতির নৈর্জন্যের একটি স্নিগ্ধ সংকোচ ব্রীড়াবশ্যতা বনলতিকা তুল্য শকুন্তলায় জড়িয়ে আছে। এ সমস্ত চিন্তা করেই কালিদাস খুব সঙ্গত কারণেই শকুন্তলার আত্মগত উক্তিতে রাজ সম্বন্ধীয় কৌতূহল এবং ঔৎসুক্য মাত্র দেখিয়েছেন। কালিদাসের এই নাটকীয়ত্ব শকুন্তলার চরিত্র-রহস্য উদ্‌ঘাটনে অধিকতর সূক্ষ্ম, সুন্দর এবং সঙ্গত বলে আমাদের মনে হয়। বিদ্যাসাগর ভিন্নতর পথাবলম্বী, তাঁর বর্ণনাত্মক কাহিনী অংশে বিস্তৃত ব্যাখ্যা বেমানান নয়। এবং প্রশংসনীয় এই যে, বিদ্যাসাগরের এই স্ব-উদ্ভাবনে মূলের কোন সৌন্দর্য হানি ঘটেনি; বরং কালিদাসের নাটক এবং বিদ্যাসাগরের উপখ্যান এই দুই ভিন্ন জগতের মূল ভাবের মধ্যে চমৎকার সাযুজ্য লক্ষিতব্য।

শকুন্তলাকে জলসেচ কার্যে নিরত দেখে রাজার মনে কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকেনা। কালিদাসের দুষ্মন্ত বলেন,

ইদং কিলব্যাজ মনোহরং বতুস্তপক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবংস নীলোৎপল পত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥[২১]

[বাংলা তর্জমা— প্রকৃতিরম্য এই মনোহর দেহ যে ঋষি কঠোর তপঃ কার্যে নিযুক্ত করতে চান, নিশ্চয় তিমি সুপেলব নীলপদ্মের পত্র দিয়ে কঠিনশমীলতা ছেদন করতে চান।]

'উপমা কালিদাসস্য'—মহাকবি বস্তুর উপমায় বস্তুর গুণধর্মকে পরিস্ফুটনের মন্ত্র-সিদ্ধ। বিদ্যাসাগর কবি নন এবং গদ্যাত্মক বর্ণনায় অধিক আগ্রহী। তাই উপরোক্ত শ্লোকাংশের বক্তব্যই ধু বাক্যে গ্রহণ করেছেন—

'মহর্ষি অতি অবিবেচক। এমন শরীরে কেমন করিয়া বল্কশ পরাইয়াছেন।'[২২] বিদ্যাসাগর ইংগিতময়তা বেশী ভালবাসেন না, কিন্তু বিস্তৃতি বর্জন ক'রে মাঝে মাঝে দুটি একটি শব্দচিত্রে মূলভাবকে জমাটবদ্ধ করতে কোথাও কোথাও নৈপুণ্য প্রদর্শন করে থাকেন। এমনি করেই কালিদাসের ইংগিতধর্মিতার অভাব অনেক-ক্ষেত্রে পূরণ করতে বিদ্যাসাগর কুশলী।

শকুন্তলার মনোগত মনোভাব অনসূয়া প্রিয়ংবদার নখদর্পণে। শকুন্তলার ছায়ানুগা-মিনী সখীদ্বয় রাজা এবং শকুন্তলা প্রথম দর্শনেই যে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট তা বুঝতে পেরেছেন। রহস্য-বিলাসিনী প্রিয়ংবদা রাজাকে তাই শকুন্তলা সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসার সুযোগ করে দিয়েছেন। রাজার মুখে প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুনে শকুন্তলার মুখ পূর্বরাগের শরমে রাঙা হয়ে উঠছে। নয়নহানা চাহনি কিংবা কৃত্রিম কোপ ইত্যাদিতে আপনার স্বরূপকে শকুন্তলা ব্যক্ত করেছেন। শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বের অভিপ্রেত বর-করে সমর্পনীয়া এ সংবাদটুকু রাজাকে জানাতে প্রিয়ংবদা যখন কসুর করলেন না, তখন শকুন্তলার শরীর কেঁপে গেল। হাজার হোক., শকুন্তলা ঋষি-পালিতা, এবং পূর্ণযৌবনা; একজন পর পুরুষের কাছে এতখানি বলা কি বিধেয়? তাই প্রিয়ংবদার উপর তার কৃত্রিম ক্রোধ ফেটে পড়ে—

'দেখ, প্রিয়ংবদা যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতেছে, আমি আর্যাগৌতমীর নিকট গিয়া এই সকল কথা বলিয়া দিব।'[২৩]

এতদূর পর্যন্ত কালিদাসের অনুসরণে বিদ্যাসাগর যাথাথ্যিক। অতঃপর স্বকীয়সৃষ্টির স্পর্শে কলিদাস এবং বিদ্যাসাগরের ব্যবধান সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু বিদ্যাসাগর

কালিদাসকে উজ্জ্বল এবং মধুর করেই বঙ্গজনের আঁখির সম্মোহন কেড়ে নিলেন।

কালিদাসের শকুন্তলা প্রিয়ংবদার বিরুদ্ধে গৌতমীর নিকট অভিযোগ করবার জন্য যখন যাত্রা শুরু করেছেন, তখন প্রিয়ংবদা পরিহাস করে বলেছেন—

রুক্‌খসে অণে দুবে ধারেসি যে। এহি জাব। অত্তানং মোআবিঅ তদো গমিস্‌সি।'[২৪]

[বাংলা তর্জমা— তুমি বৃক্ষে জলসেচ করতে গিয়ে দুবার আমার কাছে জল-ধার। এখন তা দাও। নিজেকে ঋণমুক্ত করে তবে যেতে পারবে।]

দুষ্মন্ত সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুরীয়ক বিনিময়ে শকুন্তলাকে মুক্ত করতে চাইলে প্রিয়ংবদা তার মুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন। এর ভিতর শকুন্তলার কোন ভাবভঙ্গী আমাদের অজানা।

কিন্তু বিদ্যাসাগরে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশের পর কার্যত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। তাই ভাণ-মধুর চলন শুরু হয়েছে। এবার কিন্তু শকুন্তলা'য় বিদ্যাসাগর বাংলা দেশকে জীবন্ত করে তুললেন। 'বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ'-র[২৫] যে চিত্র বাঙালীকে রসানন্দে আপ্লুত করে দেয়, তেমন বোধ করি, পৃথিবীর আর কোন দেশের মানুষকে নয়। আমাদের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে কলস কাঁখে সরসী গমন উদ্যতা শকুন্তলার এক টুকরো মধুর ছবি! সেখানে শকুন্তলাকে আটক করে প্রিয়ংবদা বলেন,—

'সখি! তুমি যাইতে পাইবেনা; আমায় এক কলসী জলধার আগে শোধ দাও, তবে যাইতে দিব।'[২৬]

শকুন্তলা, কিঞ্চিৎ কুপিতা হইয়া, ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত, কলসী লইয়া, জল আনিতে উদ্যত হইলেন।'

এই কলস, কলস কাঁখে 'জলকে' খাওয়ার ছবি কালিদাস কোথায় পাবেন? এযে বাংলার নিজস্ব এবং শাশ্বত ছবি! এ শকুন্তলা বাংলার পল্লীর ঘরে ঘরে

একান্ত প্রত্যক্ষ। কালিদাসের ঋষিতনয়া শকুন্তলা বাংলার লক্ষ কুটিরের শোভা— 'জলকেচল' বধূকন্যার ছবি! বিদ্যাসাগরের বাহাদুরি তিনি কোন্ দূর অতীতের মহাকবিকে বঙ্গে পরিচিত করলেন কিন্তু বাঙালী মেয়ের সাজে শকুন্তলাকে সাজিয়ে নিয়ে। বিদ্যাসাগরের মানস-নন্দিনীর 'জলভরণে' চলার দৃশ্যটি বাঙালীর রসপিপাসাকে চরিতার্থ করলো। এ ভাবেই কালিদাসের পাশে বিদ্যাসাগর আপন স্বাতন্ত্র্য জজ্বল্যমান করে তুললেন।

আর দুষ্মন্ত অঙ্গুরীয়ক দিয়ে শকুন্তলাকে কেবল মুক্তই করলেন না, বরং শকুন্তলাকে প্রকৃতই এই অঙ্গুরীয় বিনিময়ে লাভও করলেন। তাই বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা মনে মনে বলেন—

'এই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে।'[২৭]

রাজা তবুও যেন নিশ্চিত হতে পারেননি, নানানতর জিজ্ঞাসায় সংশয়াতুর হয়ে পড়ছে তাঁর মন। কালিদাস এই সময়কার রাজার মানসিকতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যভিমুখং ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসংমুখীনা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ [২৮]

[বাংলা তর্জমা— আমি কথা বললে সে কথা কয়না; অথচ আমার কথা বলবার সময় উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শোনে। আমার দিকে সে ভাল করে তাকায় না, অথচ বেশিক্ষণ অন্যদিকে নিজের দৃষ্টিকে ধরে রাখতেও পারেনা।]

বিদ্যাসাগরের অনুবাদে সংযোজন আমন্ত্রিত। বর্তমান শ্লোকের অনুবাদে সংযোজন স্বাভাবিকত্বের পরিপন্থী না হয়ে যে পরিবর্ধক হয়েছে, তা এই উদ্ধরণে প্রমাণ্য—

'আমার সহিত কথা কহিতেছেনা; অথচ আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্ত হইয়া স্থিরকর্ণে শ্রবণ করিতেছে; নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে তৎক্ষণাৎ

মুখ ফিরাইয়া লইতেছে ; অথচ অন্যদিকেও অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতেছে না। অন্তঃকরনে অনুরাগ সঞ্চার না হইলে, কামিনীদিগের কদাচ এরূপ ভাব হয়না।'[২৯]

শকুন্তলার উন্মনচিত্ত বর্ণনার পর রাজা বিশেষীকরণ থেকে সাধারনীকরণে আপন অনুরাগকে তৃপ্ত করলেন। শকুন্তলা অনুরাগিনী সুনিশ্চিত ; হেতু অনুরাগিনী মহিলাদের ক্ষেত্রে যে অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে থাকে, শকুন্তলায় তার পূরো লক্ষণ ফুটে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের এই স্বকৃত-সংযোজন মূলানুগত্য সত্ত্বেও আর একটু সৌন্দর্য সঙ্গতি সুন্দরতায় মধুর করে দিয়েছে। বিদ্যাসাগর কালিদাস হতে চাননি তা আমরা জানি। কিন্তু কালিদাসকে স্মরণে রেখেই বলা চলে যে, এমন সব জায়গায় বিদ্যাসাগরকে আমরা অতি সহজেই পৃথক করে চিনে নিতে পারি।

বিশ্রব্ধ আলাপণ যে তবোবন বিরুদ্ধ, তা জানাতে যেন মত্ত মাতঙ্গীর উন্মত্ততায় ছিন্নভিন্ন ভয়ার্ত তপোবন প্রকৃতির আর্ততার সংবাদ এল। সখীদ্বয়, শকুন্তলা, রাজা প্রত্যেকেই অপ্রত্যাশিত এই দুঃসংবাদে এককালীন বিরক্ত, ক্ষুব্ধ এবং সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। বিদায় পর্ব যে এত সত্বর এবং এমনি সাদামাটাভাবে ঘটবে, তা কি কেউ-ই জানতেন ? তাই সৌজন্য রক্ষার্থে সাক্ষীরা যখন রাজাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন—

'মহারাজ ! যেন পুনরায় আপনকার দর্শন পাই।'[৩০], তখন বিক্ষুব্ধ দুষ্মন্ত চিত্ত আঁধারে আলো দেখতে পেলো।

ঝড়ঝঞ্ঝার মতই বিশ্রব্ধালাপ ভাঙতে কালিদাসের দুরন্ত লেখনী আর একবার তুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে। মত্ত মাতরঙ্গীর আগমনে শান্ত আশ্রমের ভয়ার্তরূপ তিনি নিখুঁতভাবে, শ্লোকবদ্ধ করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কেবল সাধারণ বর্ণনায় সমাপ্তিরেখা টানতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। দ্বিরুক্তি সত্ত্বেও আমরা বলতে বাধ্য যে, নাটকীয় পরিস্থিতি (situation) বিদ্যাসাগরের বর্ণনীয় নয়। নাটকীয়ত্ব বর্জন করতে গিয়ে নিষ্কম্প লেখক নিষ্কুণ্ঠ বর্জন করে চলেছেন। তাতে কালিদাসের সূক্ষ্ম ভাবলোক অস্পর্শিত হলেও বিদ্যাসাগর সুকৌশলে মূলের সঙ্গতি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

অনন্তর বিদায়ের পালা। রাজা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আলাপন পর্ব অসমাপ্ত

রেখেই নেহাৎ অতৃপ্তচিত্তে মত্তহস্তী নিধনে অগ্রসর হলেন। আর শকুন্তলার দুই চারি পা' গিয়েই পিছন ফিরে রাজাকে দর্শন করবার চিত্রে কালিদাস লিপিচাতুর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন। বিত্থাসাগরে সংক্ষেপিত হলেও বল্কলমোচন ছলে বিলম্ব করিয়া দুষ্মান্তকে নিরীক্ষণরতা শকুন্তলার ছবি কম মনোহর নয়।

আবার আলাপ-অতৃপ্ত, অবসন্ন দুষ্মন্তের মনের অবস্থা কালিদাসের নিম্নোক্ত শ্লোকে চিত্রবৎ ভাসমান—

গবছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদ সংস্থিতং চেতঃ
চীনাংশু কনিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্থ ।।[৩১]

[বাংলা তর্জমা—এদেহ আমার সম্মুখে টেনে নিয়ে চলেছি বটে, কিন্তু অর্ধেক মন যেন পিছনে পড়ে থাকলো। ঠিক যেমন পতাকার সূক্ষ্ম বস্ত্র বিপরীত বাতাসে পিছনপানে উড়ে চলে।]

বিত্থাসাগরের দুষ্মন্ত তপোবনের অদূরে শিবির স্থাপন করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলেন,

'কি আশ্চর্য! আমি কোন মতেই, আমার চঞ্চল চিত্তকে শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছিন।'[৩২]

অর্থাৎ কালিদাসের সমাপ্তি শ্লোক বিত্থাসাগরে পরিত্যক্ত। কিন্তু দুষ্মন্তচরিত্র পরিস্ফুটনে কালিদাসের স-উপম শ্লোক-উদ্ধার করলে বিত্থাসাগর তাঁর দুষ্মন্তকে অধিকতর প্রাণবন্ত করে তুলতে সমর্থ হতেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, বিত্থাসাগরীয় সর্বশেষ রাজোক্তিতে সন্দেহাতীত ভাবে রাজার মানসপ্রতিফলন ঘটেছে। উপাখ্যানভাগে বিত্থাসাগর আপনার রীতির সীমায়িতি সম্বন্ধে সতত সজাগ। তাই কালিদাসী নাটকীয় ভঙ্গিমার আশ্রয় গ্রহণ করে স্বীয় অবলম্বিত রীতির ব্যত্যয় ঘটাতে তিনি কখনই রাজি নন।

দ্বিতীয় অংক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় অংকে কালিদাস রাজা দুষ্মন্ত মানসের এক মধুর চিত্র উদ্ঘাটন করলেন। প্রথমাংকের ত্বরিত বিদায়ের বেদনা এখনও মনের কোণে সঞ্চিত এবং শকুন্তলার ছবি নয়ন পল্লবে কম্পিত। অন্তরে প্রত্যয় কম্পমান শকুন্তলা হয়ত তাঁর প্রতি অনুরাগিনী। কিন্তু তপোবন প্রকৃতির ভিতর শকুন্তলার সঙ্গে পুনরায় সমাগম অসম্ভব মনে হতেই তাঁর আশালতা ছিন্ন হয়ে যায়। রাজার এই সংশয়াকুল মনের ছবি কালিদাস চমৎকারভাবে দ্বিতীয় অংকে বিদূষক -দুষ্মন্ত সংবাদে তুলে ধরলেন।

বিদূষক প্রসঙ্গে দুটি কথা খুব মূল্যবান। সংস্কৃত নাটকে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে পাঠকদের উৎঠাকে কথঞ্চিৎ উপশমিত করবার জন্যে ভাঁড়-জাতীয় বিদূষক আমদানি করা হয়ে থাকে। এরা প্রধানত অঙ্গভঙ্গী এবং স্থূল হাস্য পরিহাসের ভিতর দিয়ে একদিকে পৃষ্ঠপোষক নৃপতি এবং অন্যদিকে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করে। তেমনি একটি বিদূষকের সঙ্গে 'শকুন্তলা'য় চলছে রাজার চিত্তবিনোদনের আলাপ। রাজার বনচরবৃত্তি এবং মৃগয়াভ্রমণের কষ্টকরতা নিয়ে বিদূষকের সরস মন্তব্যগুলি উপভোগ্য। দুষ্মন্ত নিঃসংকোচে অদ্য মৃগয়া-গমনে তাঁর অনিচ্ছার কথা জ্ঞাপন করলে তাদের রসালাপ জমে উঠে। মৃগয়াবিলাসী শ্রান্তরাজার এই মনোভাব কালিদাস চমৎকার শ্লোকবদ্ধ করলেন—

> গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতং
> ছায়াবদ্ধ কদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থনভ্যস্যতু।
> বিশ্রদ্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতি পল্বলে
> বিশ্রামং লভতামিদং চ শিথিলজ্যা বন্ধম স্মদ্ধনুঃ।৩৩

[বাংলা তর্জমা— শৃঙ্গ দ্বারা আন্দোলিত নিপাণ সলিলে মহিষেরা অবগাহন করুক; তরুচ্ছায়াতলে যুথ-সুন্দর মৃগীকুল রোমন্থন করুক; নির্ভয় বরাহেরা মুস্তা-ভক্ষণ সুখে পল্বল বিলোড়িত করুক; শিথিলজ্যা ধনুকের জন্যই আজ শূন্যতুনীর বিশ্রাম লাভ করুক।]

বিদ্যাসাগর এই শ্লোক গ্রহণ করেছেন। এবং বিশ্বস্ত অনুবাদের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

"অন্য মহিষেরা নিপানে অবগাহণ করিয়া নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক; হরিণগণ তরুচ্ছায়ায় দলবদ্ধ হইয়া রোমন্থ অভ্যাস করুক; বরাহেরা অশঙ্কিত চিত্তে পল্বলে মুস্তাভক্ষণ করুক; আর আমার শরাসনও বিশ্রামলাভ করুক।"[৩৪]

কালিদাসের দুষ্মন্ত নিষ্কুণ্ঠায় বিদূষকের নিকট শকুন্তলার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা ব্যক্ত করেছেন। বিদূষক রসভরা বিদ্রূপে আপন বিস্ময় প্রকাশ করেছে—

ভো বঅসস, তে তাবসকণ ণআ অত্তথণীআ দীসদী।'[৩৫]

কালিদাসের বিদূষক বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে এইরূপ লাভ করলো—

'একি বয়স্য! তপস্বীকন্যায় অভিলাষ!'[৩৬]

কিন্তু শকুন্তলার প্রতি রাজার যথার্থ এবং গাঢ় অনুরাগের সমর্থন করে বিদূষক কৌতুককর ভঙ্গীতে বলে—

"বিদূষকঃ (বিহস্য) জহ কস্স বি পিণ্ডখজ্জুরেহিং উরেবজ্জিদস্স তিন্তিনীএ অহিলাসো ভবে, তহ ইত্থি আরঅণ পরিভোইনো ভাবদো ইঅং অত্তথণা।"[৩৭]

[বাংলা তর্জমা—যেমন পিণ্ডখেজুর খেয়ে অনেকের মুখে অরুচি জন্মালে তেঁতুলে সাধ যায়, ঠিক নারীরত্ন সমূহ উপভোগ ক'রে আপনারও তেমনি সাধ জেগেছে।]

বিদ্যাসাগর কালিদাসের মর্যাদা সম্বন্ধে সর্বথা সতর্ক; তার জলন্ত সাক্ষ্য কালিদাসীয় এই অপূর্ব-সুন্দর উপমার যাথার্থ্য রক্ষায় মিলবে। বিদ্যাসাগরের অনুবাদে কালিদাসের কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হবে—

"মাধব্য শকুন্তলার প্রতি রাজার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, যেমন, পিণ্ড খর্জুর ভক্ষণ করিয়া, রসনা মিষ্ট রসে অভিভূত হইলে, তিন্তিলী ভক্ষণে স্পৃহা হয়; সেইরূপ স্ত্রীরত্নভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, তুমি এই অভিলাষ করিতেছে।"[৩৮]

এরপর রাজা শকুন্তলার রূপগুণের প্রশংসা কীর্তন শুরু করলেন। কালিদাস তাঁর অনিন্দ্যশ্লোকমালায় শকুন্তলার রূপরাশির বর্ণালী নয়নহারী করে তুলেছেন। বিদ্যাসাগর এই সমস্তশ্লোকের ভাবদিগন্তে কালিদাসের অনুবর্তী। তবে ৯-সংখ্যক শ্লোকের কালিদাসের বর্ণনার যাদু বিদ্যাসাগরে ক্ষীণাভাসে স্পর্শিত; শ্লোকের জমাটবদ্ধভাব অংশত বিচ্ছিন্নতায় শিথিল। এবং দেহবর্ণনার ক্ষেত্র একটু বিস্তৃত স্থান গ্রহণ করেছে—

কালিদাস—

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্বযোগা
রূপচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ।[৩৯]

[বাংলা তর্জমা— প্রথমে চিত্রপটে অংকন করবার পরই যেন তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, অথবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহযোগে সৃষ্টির অনেক পূর্বেই বিধাতা মনোলোকে এই শ্রীরত্নবপু সৃষ্টি করেছিলেন বলে আমার বোধ হয়। কেবলমাত্র হাতে তৈরী হলে এ রূপলাবণ্য কখনও সম্ভব হ'ত না।]

বিদ্যাসাগর—"অধিক আর কি বলিব, তার শরীর মনে করিলে মনে এই উদয় হয়, বুঝি বিধাতা, প্রথমত চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া, পরে জীবনদান করিয়াছেন; অথবা, মনে মনোমত উপকরণ সামগ্রী সকল সংকলিত করিয়া, মনে মনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-গুলির যথাস্থানে বিন্যাসপূর্বক, মনে মনেই তাহার শরীর নির্মাণ করিয়াছেন; হস্তদ্বারা নির্মিত হইলে, শরীরের সেরূপ মার্দব ও রূপলাবণ্যের সেরূপ মাধুরী সম্ভবিত না।"[৪০]

কিন্তু ১০ সংখ্যক শ্লোকে বিদ্যাসাগর কালিদাসের শ্লোকের সুসংবদ্ধ সংরাগী; সীমিত পরিধির ধ্যানী। যেমন কালিদাস বলেন—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈ—
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপসনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥[৪১]

এখানে বিদ্যাসাগর আক্ষরিক অনুবাদে তৎপর এবং তাঁর অনূদিত অংশ আলোচ্য শ্লোকের অর্থবোধের পক্ষে যথেষ্ট বলে পৃথক কোন বাংলা তর্জমা নিষ্প্রয়োজন।

"রাজা কহিলেন, তাহার রূপ অনাঘ্রাত প্রফুল্ল কুসুমস্বরূপ, নখাঘাত বর্জিত নবপল্লব-স্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্নস্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধুস্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্য-রাশির অখণ্ডফলস্বরূপ; জানিনা, কোন্ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্মলরূপের ভোগ আছে।"[৪২]

শকুন্তলার রূপ বর্ণনা শ্রবণে বিদূষকের বুঝতে বাকি থাকেনা যে, রাজার মন শকুন্তলায় অপহৃত। এমন ক্ষেত্রে শকুন্তলা রাজমহিষী না হলে যে তা ক্ষতিকর, মুহূর্তে তার মনে এ চিন্তা খেলে যায়। তাই এমন মহার্ঘ নারীরত্ন যাতে দুষ্মন্ত ভোগ্য হয়, তার জন্যে বিদূষকের ব্যগ্রতা পরিলক্ষিত হল—

'তে ণ হি লহু পরিত্তাঅদু নং ভবং মা কস্স বি তবসিস্সনো ইঙ্গুদীতল্লচিক্কণসীসস্স ইথে পড়িস্সহি।'[৪৩]

[বাংলা তর্জমা— তা হ'লে, বাস্তবিক, তাকে আপনি সত্বর উদ্ধার করুন। খবরদার, যেন কোন ইঙ্গুদী তৈল মসৃণ মস্তক তপস্বীর হাতে তিনি না পড়েন, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।]

বিদ্যাসাগরে আমরা পেলাম, "তবে শীঘ্র তাহাকে হস্তগত কর; দেখিও, যেন, তোমার ভাবিতে চিন্তিতে, এরূপ অমূল্যরূপনিধান কন্যানিধান কোনও অসভ্য তপস্বীর হস্তে পতিত না হয়।"[৪৪]

বিদ্যাসাগর এখানে বিদূষকের মুখে তপস্বীদের সম্পর্কে নিজস্ব ভাবনা সংযোজন করেছেন। তাঁর বিদূষক আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপর যে 'অসভ্য' বিশেষণটি প্রয়োগ করেছে, তা বিদূষক বলেই ক্ষমার্হ; নতুবা রুচিশীল কোন স্থিতধীর মুখে এই উক্তি অশোভন। সত্য বটে সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের মুখে 'দাসীপুত্র' এই একটি শব্দের গালিস্বরূপ ব্যবহার মাঝে মধ্যে দেখা যায়; কিন্তু কালিদাসে তার কোন উল্লেখ-মাত্র নেই। বিদ্যাসাগর এ জাতীয় শব্দ কেন প্রয়োগ করলেন, তা বেশ ভাববার কথা।

কারণ সুরুচি-রুচির বিদ্যাসাগর-মানস 'শকুন্তলা' তাঁর সমগ্র সৃষ্টির প্রধান এবং বোধ করি, শ্রেষ্ঠ। আমাদের মনে হয়, তপস্বীদের উপর বিদ্যাসাগরের জাত-ক্রোধ কোন কালেই ছিলনা। কেবলমাত্র বিদূষকের স্থূল রসিকতা ও ভাঁড়ামির সংস্কার এ ক্ষেত্রে তাঁর মনে ক্রিয়াশীল, যার জন্যে তিনি তপস্বীদের প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ করে ফেলেছেন। তবু স্মরণ রাখা দরকার যে, এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগে মূলের ভাবও সৌন্দর্যের বিলক্ষণ হানি ঘটে। কালিদাসীয় শান্ত, সুমিত পূত বাতাবরণে বিদূষকের রঙ্গকৌতুকময় বাক্যব্যবহারেও যে সমুন্নতি অক্ষুন্ন ছিল, এখানে একটি শব্দের অসর্তকতাজনিত অপপ্রয়োগে তার অবনমন অতীব দুঃখজনক।

যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত বিদূষক-দুষ্মন্ত 'কি ছলে' আরও কিছুদিন তপোবনে অবস্থান করা যায়—তার উপায় উদ্ভাবনে চিন্তিত হলেন। বিদূষক নির্দেশিত রাজস্ব 'আদায় ছলে' দুষ্মন্তের নিকট গ্রহণীয় নয়; কারণ তপস্বিগণের তপস্যালব্ধ পুণ্যের দাম রাজস্বে অপরিমাপনীয়। অথচ দুষ্মন্তকে অনেক ঋষি ইতিমধ্যেই চিনে ফেলেছেন। সুতরাং অন্যছল কি পাওয়া যায়?

এ-দিকে চক্রান্তকারী ঘটনাপতি 'ছল সৃষ্টি' করে রেখেছিলেন; শীঘ্র সে ছলের সন্ধান দুষ্মন্ত পেলেন। পিশাচ দল যজ্ঞীয়ভূমে অত্যাচার শুরু করেছে। আর্তের রক্ষণ ক্ষত্রিয়ধর্ম; অতএব দুষ্মন্তের নিরাপদ 'ছল' জুটে গেল। কিন্তু অত্যাচার এবং যজ্ঞভূমির শঙ্কিল ছবি অঙ্কন ক'রে কালিদাস আমাদের শরীরে মনে আকস্মিকভাবে শিহরণ সৃষ্টি করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী এই নাটকীয়ত্ব বর্জন করেছেন। এবং কেবলমাত্র তপস্বীদের অনুরোধে রাজা নিজেকে অনুগৃহীত মনে করেই সন্তুষ্ট হলেন। মাধব্য-ও রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভুল করলোনা—

'বয়স্য! মন্দ কি, এ তোমার অনুকূল গণ্ডহস্ত।'[৪৫]

পিশাচনিধনে রাজা যাত্রার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এমন সময় দুঃসংবাদ এল রাজধানীতে দুষ্মন্ত-জননী কোন ব্রত উপলক্ষে রাজাকে স্মরণ করেছেন। কালিদাস এবং বিদ্যাসাগর উভয়ে 'তপস্বীদিগের কার্যে সাতিশয় ব্যস্ত আছি'[৪৬]—এক মিথ্যা ঢাকতে আর এক মিথ্যাশ্রয়ী রাজাকে আমাদের দৃষ্টির নিকট তুলে ধরেছেন। স্থির হ'ল—বিদূষক মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য রাজার প্রতিনিধি হিসেবে রাজধানীতে

প্রত্যাবর্তন করবে।

কিন্তু দুষ্মন্তের তন্দ্রা ছুটে যায়, তবু মাধব্যকে শকুন্তলার বৃত্তান্ত বলা মানে হাটে হাঁড়ি ভাঙা আর কি! সুতরাং রাজাকে সতর্ক হতে দেখা যায়। বিদূষককে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে দুষ্মন্ত তার হাত ধ'রে বললেন, 'বয়স্য, ঋষিরা কয়েকদিনের জন্য তপোবনে থাকিতে অনুরোধ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত রহিলাম; নতুবা, যথার্থই আমি শকুন্তলাতে অভিলাষী হইয়াছি এরূপ ভাবিও না। আমি ইতিপূর্বে তোমার নিকট শকুন্তলা সংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি, সে সমস্তই পরিহাসমাত্র; তুমি যেন, যথার্থ ভাবিয়া, একে আর করিওনা।'[৪৭]

মাধব্য তাই বিশ্বাস ক'রে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলো। কালিদাসের এই ঘটনাসংকেত বিদ্যাসাগর হুবহু অনুসরণ করলেন। এই তুচ্ছ ঘটনা যে ভবিষ্যতের কেবল কার্যকারণ সম্পর্ক ছিন্ন করলো, কালিদাস ষষ্ঠাংকে পরিষ্কার ক'রে তা বলেছেন। বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব এই যে, কালিদাসের বিদূষক তাঁর হাতে বেশ জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। দুষ্মন্তের প্রতি বিদ্যাসাগরের ঔদাস্য এই নতুন নয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দুষ্মন্ত কথঞ্চিৎ প্রাণাবেগ পূর্ণ; বোধ হয়, বিদ্যাসাগরের বিদূষকের সংস্পর্শে মুক্তমন এবং আনন্দকর মুহূর্তে দুষ্মন্ত অনেকটা জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। সংস্কৃত 'অভিজ্ঞানম শকুন্তলামে' নাটকীয় উপশম হিসেবে, একটু লঘু হাস্য কৌতুককর পরিবেশময় দ্বিতীয়াংকের তাৎপর্য কম নয়। রাজার ভবিষ্যৎ কার্যধারার সূত্রসন্নিবেশ অতঃপর ঘটনার আকর্ষণকে জটিল, এবং গ্রন্থিবদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করবে। বাংলায় বিদ্যাসাগরী উপাখ্যানে নাটকীয়ত্ব বিসর্জিত। বর্ণনাত্মক 'দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ' মৃদু হাস্য পরিহাসে এবং বেদনার লঘুত্বে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

তৃতীয় অংক : তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসাগর অনুবাদক এবং মৌলিকসৃষ্টি তাঁর নেই বলে আমাদের আপসোসের অন্ত নেই। আপাত-দৃষ্টিতে 'শকুন্তলা থেকে শুরু করে 'ভ্রান্তি বিলাস' পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের প্রসিদ্ধ রচনাবলী অনুবাদ ছাড়া কিছু নয় বলেই মনে হয়। কিন্তুঅনুবাদক কেন যে মৌলিকত্বস্পর্শবর্জিত হবেন তা ভেবে পাওয়া যায় না। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত সৃষ্টি যদি হয় আন্তরিক, তবে তাতে অনুবাদকের ভাব-

কল্পনার স্পর্শ পড়তে বাধ্য। কারণ ভাল অনুবাদ নিছক অনুবাদ হিসেবেই হয়েছে, কোন ভাষাসাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল। মূল স্রষ্টার ভাবমুহূর্ত বা চিত্ত প্রশান্তি অথবা আলোড়িত আবেগ অনুবাদকের চিরস্পর্শাতীত। তবু অনুবাদক এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় ভাবসাযুজ্যে মূলের রস বিশ্বস্ততার সঙ্গে সঞ্চার ক'রে পাঠকের তৃপ্তিবিধান করতে সমর্থ। তাই অনুবাদ চিরকাল চলে, ভাবিক, ছায়িক এবং আক্ষরিক—তা সে যে ভাবেই হোকনা কেন। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে অন্তত মূলের রস ও রহস্য আনন্দাবেগের নৈকট্যে পোঁছানোর আকুলতা অনুবাদকে লক্ষণীয়। এবং এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরণের বিচিত্রবিধ কৌশল আয়ত্ত করে যিনি মূলের ভাবসৌন্দর্য বিনষ্ট না করেও বরং মূলের কাছাকাছি পৌঁছুতে সক্ষম, তিনিই যথার্থ অনুবাদক। বিদ্যাসাগরের সাহিত্যালোচনার প্রাক্কালে আমাদের এ সত্য অঙ্গীকার করতে হবে যে, বিদ্যাসাগর অনুবাদক হয়েও বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতি বঙ্গীয় জীবনাবেগে এবং পরিপার্শ্ব আরোপে সমর্থ হয়েছেন। আপন অন্তরের বেদনাবোধ দিয়ে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজে নিপীড়িত নারীর মূক বেদনাকে করেছেন পৌরানিকী নারীহৃদয়ে পরিশ্রুত; এবং স্বীয় আন্তররস জারিত ঐ নববেদনার চরিত্রচিত্র অনুসন্ধান করে পেয়েছেন সীতা ও শকুন্তলায়। আর এঁদের বিশিষ্ট চরিত্রদ্যুতিতেই আপন হৃদয়ের ভাববন্যা উজার করে দিয়ে অনুবাদক হয়েও বিদ্যাসাগর স্বকীয়তায় ভাস্বর।

অনুবাদে বিদ্যাসাগর যে আপন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর যে কোন অনুদিত গ্রন্থে বিশেষ করে 'শকুন্তলা'য় সুপরিস্ফুট। সৃজ্যমান বাংলা গদ্যের কুয়াষাছন্ন দিগ্‌ভ্রান্ততায় বিদ্যাসাগর 'মাভৈঃ' বাণী উচ্চারণ ক'রে তার বন্ধনমুক্তির জয়গান গাইলেন। বাংলা ভাষা মুক্তির আনন্দে পেল প্রথম চলার আবেগ। কিন্তু গঠনযুগের দুর্বল ভাষা পরস্ব অপহরণ করেই আপন বেগে ছুটে যেতে চায়। বিদ্যাসাগর শিশুগদ্যের দৌর্বল্য মুক্তির জন্যেই সংস্কৃতের দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেওয়ারও স্বপ্ন দেখলেন। দুর্বল বাংলা ভাষাকে শক্তিশালী করবার বাসনা নিয়েই ক্লাসিক এবং শক্তিস্পর্ধী সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়ে বিদ্যাসাগর যুগ এবং জীবনের দাবীকেই কেবল স্বীকার করেননি, বরং বাংলা ভাষার ভবিষ্যত সার্থকতার স্বপ্ন-ও দেখেছিলেন। তাই বাংলা ভাষা সাহিত্যের আদিস্বাপ্নিক বিদ্যাসাগরের অনুবাদ রচনা কেবলমাত্র অনুবাদ বলে উড়িয়ে দেওয়া খুব সহজ নয়।

তাছাড়া, আরও কথা রয়েছে। অনুবাদকমাত্রই যদি কেবল অনুবাদক বলে দূষণীয় হতেন, তবে পৃথিবীর সাহিত্যের অনেকাংশই হত নিন্দিত। আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠপ্রতিভূ কালিদাসের অধিকাংশ রচনা যেমন 'কুমারসম্ভব', 'রঘুবংশ', শকুন্তলা ইত্যাদির মূল কাহিনী ভারতীয় পুরাণ-জগৎ। সেক্সপীয়রীয় বহু নাটকের বিষয় ইতিহাস। ফিট্জেরাল্ড ওমরখৈয়ামে হতেন নিন্দাহ'; আমাদের প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদে হতেন নিন্দনীয়! বিশ্বের বড় সাহিত্যিকদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে-কোন তুলনাই হয়ত বাতুলতা, কিন্তু এক্ষেত্রে সাহিত্যে পরস্বভাব অঙ্গীকার কিংবা বিষয় গ্রহণের সাধারণ ধর্মের কথা বলাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বিদ্যাসাগর কালিদাস, ভবভূতি, বাল্মীকি কিংবা সেক্সপীয়ার থেকে সহস্রবিধ ঋণ গ্রহণ করেও যে আপন মূল্যে আপনি বিশিষ্ট হতে পারেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। তাঁর অনূদিত গ্রন্থরাজিই তাঁর সাহিত্যিক সত্তার বৈজয়ন্তী।

তাছাড়া অনুবাদের ভিতর দিয়ে পরস্ব ভাবাহরণ ক'রে সাহিত্যিকগণ ভাষা-সাহিত্যের প্রবহমানতা বজায় রাখেন। যখন বন্ধ্যাযুগ সাহিত্যের উষরক্ষেত্র প্রকট করে তোলে, তখন ক্ষুদ্র প্রতিভার কাছে বিশ্বপরিক্রমার সুযোগ আসে। এ সুযোগের ফল বড় সুদূরবিসারী। ইংরেজী সাহিত্যের অলস কবি-সাহিত্যিকগণ অনুবাদ শাখাকে এত সমৃদ্ধ না করলে কিসে সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি এত বিচিত্র-মুখী হ'ত? বাংলা গদ্যের জন্মলগ্নের আদি পর্বে একদল অনুবাদক যখন এমনি অনুবাদ কর্মে ব্যাপৃত, তখন বিদ্যাসাগর এক হাতে স্থপতির তপুণ চালনা করতে গিয়ে সংস্কৃতের দ্বারস্থ হয়েছেন এবং অপর হাতে বাংলার শ্যামকোমল প্রাণের গতিময়তার সড়ক নির্মাণ ক'রে তাতে স্থাপত্য ধর্মিতা এবং চিত্রময়তার সোনার তুলির স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের সোনার ফসল 'শকুন্তলা'। মূলের ভাবের প্রতি সর্বদা সর্বপ্রযত্নে শ্রদ্ধা পোষণ করেও আপন অন্তরের সুপ্তস্রষ্টার সৃষ্টির যাদুকে বর্ণরঞ্জিত করেছেন। 'শকুন্তলা'র 'তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদ' তার স্বর্ণমিনার। বর্তমান নিবন্ধে 'শকুন্তলা'র 'তৃতীয় পরিচ্ছেদ' কিভাবে কালিদাসীয় যাদু আত্মসাৎ ক'রে সুমিত স্বাঙ্গীকরণের মধ্য দিয়ে আপনার ক'রে প্রকাশ করেছেন, অতঃপর তার সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে।

শকুন্তলাকে তিলেক না দেখতে পেয়ে দুষ্মন্তের অন্তর অস্থির হয়ে উঠেছে। তাঁর মনের ভিতর সমগ্র সৃষ্টি শকুন্তলাময়। শকুন্তলা যেন কখনো নিকটে এসে লাজ-নম্রবদন মৃত্তিকা তলে আবদ্ধ ক'রে কিংবা রাজার চিত্তে আকুলতা জাগিয়ে পালিয়ে যায়। সংস্কৃতশাস্ত্রে বর্ণিত বিরহীদের দশ-দশার অনেকগুলি যেমন, স্বেদ, কম্পন, মোহাবেশে রাজা কাতর হয়ে পড়েন। আহারে-বিহারে স্বপনে শয়নে একই অবস্থা। কণ্ব-তপোবনের প্রান্তদেশে অবস্থান দুর্বিষহ হয়ে উঠে, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় মুনিদের ভিতর যেতেও কষ্ট লাগে।

কিন্তু কালিদাস নবরত্ন সভা ছেড়ে ধূলিম্লান মর্ত্য কোণে নেমে এসেছেন এবং অনুরাগবিদ্ধ এক যুবকের হৃদয়াকুলতা — দেহের বিশীর্ণতার ভিতর দিয়ে কামোত্তপ্ত পরিবেশ তুলিকাবদ্ধ করলেন। মহাকবির লেখনীমুখে রূপজমোহ বর্ণনার ফোয়ারা ছুটেছে, আর সেই সঙ্গে দেহরূপতৃষ্ণ দুষ্মন্তকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে কামনার কূলে কূলে! কিন্তু একি কেবল কবির বাড়াবাড়ি? নবরত্ন মণ্ডপ ছেড়ে কালিদাস মানুষের গোপন মনের সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করলেন কি ক'রে, তা ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে। কিন্তু জীবনাভিজ্ঞ কবির কারবার যে কেবল কল্পনার গজদন্ত মিনার নিয়ে নয়, কালিদাস তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য। আর শকুন্তলায় তাঁর জীবনবোধ কবিকল্পনার আলিম্পনে বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে গেছে।

কালিদাস প্রকারান্তরে তৃতীয় অঙ্কে জগতের ধ্রুবসত্যের এক মধুর পরিচয় দিলেন। প্রেম ব'লে তরুণ-তরুণী যে জিনিসটিকে প্রথম প্রথম বোঝে, তাহ'ল অনিবৃত্ত রূপ-তৃষ্ণা! সে তৃষ্ণা রূপের আগুনে তরুণ-তরুণীকে করে দগ্ধ, দিগ্ধ! প্রথম আকর্ষণ যে জলন্তকামনা, সে কথা কি মহাকবি কলিদাস গোপন করতে পারেন? কিন্তু কালিদাস বলেন, শকুন্তলার রূপ ব্যতীত দুষ্মন্ত এখন কি চান? শকুন্তলার অরুণিম অধর, উষ্ণ স্তন মাধুরী, বিজলিভরা নয়ন, মদনাকুল গমন ভঙ্গী এ সবই ত দুষ্মন্তের আকাঙ্খ্য! অর্থাৎ দুষ্মন্ত-চক্ষে শকুন্তলা কেবল রূপবহ্নি! দুষ্মন্তের মন কেবল ঐ রূপবহ্নিতে ঝাঁপ দেবার জন্য চঞ্চল। সত্যি বলতে কি শকুন্তলার দেহজদ্যুতি—রূপজমোহ-ই রাজার আস্বাদ্য। কালিদাস আমাদের লুকানো এক মহাসত্যকে নিয়ে হাটে হাঁড়ি ভাঙতে চান বলেই দুষ্মন্তকে কামানলে দগ্ধ করে তপোবনে রেখেছেন। আর তপোবনের সবুজ লতার আড়ালে লুকানো বাড়বাগ্নিকে আকণ্ঠ পান করবার জন্য রাজার কি কান্না!

দুষ্মন্তের দিকে তাকিয়ে কালিদাস বলেন, কামনার কালিদহে দুষ্মন্ত ভাসমান; শকুন্তলার তপ্ত আলিঙ্গন ব্যতীত রাজার এ কামনা এবং কামোত্তেজনার প্রশমন নেই।

নিঃসংকোচে মহাকবি দুষ্মন্তের 'ছল' করে তপোবনে লুকিয়ে শকুন্তলা-শিকার অভিযানে তাই ফুলশর মদনকে ডেকে এনেছেন। কামানলে পোড়া রাজা কৃশদেহটি বহন করে শকুন্তলার অবস্থান-স্থান সন্ধান করতে লাগলেন।

আমরা দেখলাম, দুষ্মন্ত কামার্ত। তাঁর মুখে কলিদাস কামসমর্থনসূচক শ্লোক দিলেন—

অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নি
ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব ইবাম্বুরাশৌ।
ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং
ভস্মাবশেষঃ কথমিত্থমুষ্ণঃ।[৪৮]

[বাংলা তর্জমা— আজও দেখছি, মহেশ্বরের ক্রোধবহ্নি তোমার শরীরে দাউ দাউ করে জলছে গহীন সাগরের বাড়বাগ্নির মত। তবে কি হে সর্ববিধান বিলোপী মন্মথ, ভস্মসার হয়েও আমার প্রতি প্রচণ্ড জ্বালাময় হবে?]

দুষ্মন্তের মুখে কালিদাস শকুন্তলার দেহসৌন্দর্য-মদিরতা ছড়িয়ে দিয়েছেন। শকুন্তলার দেহজদুতি এবং স্তনযুগলে দুষ্মন্ত-দৃষ্টি অন্ধ। রাজার প্রতপ্ত হৃদয়াবেগধৃত এই জাতীয় একটি শ্লোক উদ্ধার করা যেতে পারে—

ক্ষামক্ষামকপোলমাননমুরঃ কাঠিন্যমুক্তস্তনং
মধ্যক্লান্ততরঃ প্রকাশ বিনতাবংসৌ ছবিঃ পাণ্ডুরা।

শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়মালক্ষ্যতে
পত্রানানিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা মাধবী॥৯॥[৪৯]

[বাংলা তর্জমা—তার মুখমণ্ডলে কপোল অত্যন্ত বিশীর্ণ, বক্ষোদেশে স্তনযুগল কাঠিন্যপীড়িত, মণিদেশ অতীব কৃশ এবং স্কন্ধদেশ নিতান্ত অবসন্ন। আকৃতি ভীষণ

বিবর্ণ। প্রেমাগুনে দগ্ধ হয়ে করুণ অথচ দেখতে নয়নলোভন। যেন উত্তপ্ত সমীরণে কচি মাধবীর শ্যামপল্লব ঝিমিয়ে পড়েছে।]

এবার বিদ্যাসাগরের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক্। দুষ্মন্ত যে শকুন্তলার রূপে পাগল, সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মনে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু শকুন্তলার আত্যন্তিক দেহলোলুপ্য বিদ্যাসাগরে বর্জিত। এ দুষ্মন্ত বরং বিরহিত, অনুতপ্ত প্রেমাগুন-জর্জরিত। এবং লেখক রূপজমোহ নিয়ে বর্ণনার বাড়াবাড়ি পছন্দ করেননি। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতে দুষ্মন্তের প্রতি সুবিচার করেছেন কিনা, তা বিবেচ্য। সত্যবটে বিদ্যাসাগরী দুষ্মন্তে অনুরাগীর আশঙ্কা জেগেছে—'তপস্বীদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে, যখন তাঁহারা আমায় রাজধানী প্রতিগমনের অনুমতি করিবেন, তখন আমার কি দশা হইবে?'[৫০]

কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠে রূপমোহময়তায় ভ্রান্ত রাজার যে উন্মত্ততা, তা-ই কি এ ক্ষেত্রে অধিক সুন্দর মনে হ'ত না? পরবর্তী ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখে এই রূপোন্মত্ততা আরও নিবিড় ও অনিবার্য মনে হয় না? রাজার রূপাসক্তিই যে একদিন নারীর প্রতি ক্রূর হয়ে উঠবে, তার সঙ্গে কালিদাসের কামান্ধ রাজার সঙ্গতি অপূর্ব সুন্দরতায় অনিন্দ্য সংযোগী। বিদ্যসাগরের এই পলায়নপর মনোবৃত্তিতে দুষ্মন্তের প্রতি তাঁর ঔদাস্যই সঙ্কেতিত নয় কি?

যাই হোক, বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার সন্ধানে দুষ্মন্ত মালিনীতীর ধ'রে এবং 'নিকুঞ্জবনের সন্নিহিত হইয়া চরণচিহ্ন প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারিলেন, শকুন্তলা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।[৫১] যথাস্থানে উপস্থিত হলেন। এবং লতামণ্ডপের আড়ালে লুকিয়ে 'রাজা বলিলেন, 'আর! আমার নয়নযুগল শীতল হইল, প্রিয়ারে দেখিলাম।'[৫২]

আর 'শকুন্তলা'ই বা কি করছেন দেখা যাক। কালিদাসের শকুন্তলার নিদারুণ বিরহদশা। সখীগণ শীতল শিলায় তাকে শয়ান করিয়ে তার শরীরে লেপন করছেন শীতলমৃণাল, অনুলেপন। কিন্তু অন্তরের জ্বালা শীতল করবে কে? কৃশাঙ্গীর অবস্থান্তর দেখে সুখেদুঃখে কর্মবিশ্রামের ছায়ানুসারিণী প্রিয়ংবদা এবং অনসূয়া মর্মপীড়িতা হয়েছেন। তাঁরা নানা ছলে প্রায় এক প্রকার জোর ক'রে শকুন্তলাকে

দিয়ে প্রণয়পত্র লিখিয়ে নিলেন। বিরহিণী শকুন্তলার এই জীবন্মৃত অবস্থা কালিদাসকেও বিচলিত করে তোলে। কিন্তু নির্লিপ্ত কবি নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অঙ্কন ক'রে গেলেন শকুন্তলার বিরহাতুর ছবি। জ্বালাজর্জরিত, শূন্য-অন্তর নিঃশ্বসিত শকুন্তলার মুখে শোনা গেল—প্রণয়পত্রিকার হৃদয়োদ্ঘাটনী বেদনাধারাপতন—

শকুন্তলা (বাচয়িত) তুহ্যণ আণে হিঅঅং মম উণ কামোদিবাবি রত্তিম্পি।
নিগি্ঘণ তবই বলীঅং তুই বুত্তমণোরহাই অঙ্গাইং ॥১৫॥[৫৩]

[বাংলা তর্জমা—(শকুন্তলা পড়তে আরম্ভ করলেন) আমি তোমার মন জানিনে, কিন্তু প্রেম হে নিষ্ঠুর! নির্মম উত্তাপে রাত্রিদিন সর্বাঙ্গ দগ্ধ করে দিলে। অথচ তুমিই ছিলে আমার গোপন বাসনার কেন্দ্রভূমি !]

এবার কালিদাসের বিরহদীর্ণা শকুন্তলার পার্শ্বে বিদ্যাসাগরের শকুন্তলাকে একটু দেখা যা'ক। বিদ্যাসাগর তাঁর মানস-নন্দিনীর জন্যে এখানে স্রষ্টার বেদনাসিন্ধু পরিপ্লাবিত করলেন। শীতল সলিলার্দ্র নলিনীদল নিয়ে বেদনাদগ্ধ শকুন্তলাকে সখীদ্বয় ব্যজন করছেন। সর্বাঙ্গ জ্বালার অসহ্য দংশনে কাতরা উন্মনা শকুন্তলা সখীদের জিজ্ঞাসা করেন, 'সখি! তোমরা কি করিতেছ?"[৫৪]

এই একটিমাত্র বাক্যে বিদ্যাসাগর শকুন্তলার হৃদয়ার্তি বিদ্যুৎবিভায় ঝলসিত করলেন। এমন সংক্ষিপ্ত অথচ সময়-সুন্দর বিরহিণীর অন্তর-উৎসারিত বাক্য-বর্ণালী সমগ্র বিদ্যাসাগরের মধ্যে খুব বড় বেশী একটা পাওয়া যাবে না। শকুন্তলার সামগ্রিক ছবি এই একটি কাব্যচিত্রে যুগান্তরেও রসজ্ঞ সামাজিকদের অন্তরে গুঞ্জরণ তুলে যায়। এই জাতীয় বাক্যে বিদ্যাসাগর কালিদাসের পার্শ্বে আপন লীলাবিলাসী এবং সর্বাভিভব শক্তির লীলা বিচ্ছুরণ করেছেন। একেই বলে শিল্পীর বিজয়।

শুধু তাই নয়, শকুন্তলা মুহুর্মুহু বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন। নির্জিত শকুন্তলার এই অবস্থা দেখে সখীদ্বয় প্রণয়-পত্র লিখিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু শকুন্তলার মুখে তার বিরহাবস্থার প্রকৃত কারণ শোনা গেল 'সেই অবধি তাঁহাতে অনুরাগিণী হইয়া আমার এই অবস্থা ঘটিয়াছে।'[৫৫] 'নারীর বুক ফাটে ত মুখ ফুটেনা'—অবস্থার এই স্বল্পবাক্য বাংলার কুটীরের কোন বিরহিণী পতিপ্রার্থিনী নারীর ছবি বঙ্গীয় প্রাণের

শীতল আরাম, এবং তা একান্ত প্রত্যাশাও বটে। আবার বিদ্যাসাগরের মানস-দুহিতার প্রণয়-পত্রিকার প্রতিও আমাদের কৌতূহল অনিবার। তাঁর মানস-কন্যা অর্ধাংশমাত্র পড়লেন,

'হে নির্দয়! তোমার মন আমি জানিনা, কিন্তু আমি তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি।'',[৫৬]

এ অনুবাদে প্রাণ জুড়ায়। বিদ্যাসাগর শকুন্তলার বেদনায় সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ। আর সেই মগ্নসত্তার গভীরতলে প্রতিধ্বনিত হ'ল বেদনার নির্ঘোষ; স্রষ্টার বেদনাসিক্ত সে ভাবগঙ্গা তাই নিটোল মুক্তার মত ভাবানুষঙ্গী শব্দ ধ্বনিব্যঞ্জনায় ধরা পড়লো। একে নিছক অনুবাদ কে বলতে চান? এ যে ধ্যানময় কবিসত্তার নিগূঢ় প্রাণরসসিক্ত মৌলসৃষ্টি! বিদ্যাসাগর লাজাবনত শকুন্তলার প্রেমাতুর মানসিক-চিত্রে কালিদাসকে স্মরণের পরপার থেকে বাংলা দেশের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন!

পাঠকবর্গের কর্ণে বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্যের এই ধ্বনিমন্ত্র নিঃশেষ না হতে হতে আমরা কালিদাসের জগতে এসে পৌঁছে গেছি। শকুন্তলার 'নির্দয়' সম্বোধনের সুযোগে দুষ্মন্ত শকুন্তলার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। এমনটি ছিল শকুন্তলার স্বপ্নাতীত। এক নাটকীয় মুহূর্তে রাজাকে সমাগত দেখে প্রিয়ংবদা এবং অনসূয়া অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। মৃত প্রায় শকুন্তলা উঠবার উপক্রম করলে নৃপতি দুষ্মন্তের অন্তর চৌচির হয়ে যেতে লাগলো। তাঁর একবার মনে হল—

কিং শীতলৈঃ ক্লমবিনোদিভিরার্দ্রবাতান্
সংবারয়ামি নলিনীদলতালবৃন্তৈঃ।
অঙ্কে নিধায় করভোরু যথাসুখংতে
সংবাহয়ামি চরণাবুত পদ্মতাম্রৌ ॥ ২০ ॥[৫৭]

[বাংলা তর্জমা— শ্রান্তিহারী পদ্মপত্র নির্মিত শীতল ব্যজনী বায়ুতে আমি কি শরীর শীতল করে দেব? অথবা হে সুতনু, কোমল এবং ক্রমক্ষীণ জঙ্ঘী, আমার ক্রোড়ে তোমার কোকনদ সদৃশ চরণযুগল স্থাপন করে তোমার শান্তি এবং সুখ-সম্পাদন করতে পারি!]

বিদ্যাসাগর এই শ্লোক বর্জন করেছেন। কারণ বোধ করি, দুষ্মন্তের মনোলোকে তাঁর গতায়াত সীমিত; সেখানকার ভাঙাগড়া সম্বন্ধে তাঁর অন্বেষা নীরব। পুরুষ-জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের উপেক্ষা কি অকারণ? তবে কি নারীর লাঞ্ছনা এবং বেদনার মূল হৃদয়হীন পুরুষ কি বিদ্যাসাগরের ক্রোধের পাত্র? এ জাতীয় প্রশ্নের কাঁটায় মন পীড়িত হয়। একবার মনে হয়, অসম্ভব না হলেও, সমকালীন সমাজের পুরুষ জাতির প্রতি বিদ্যাসাগর খুব একটা প্রসন্ন ছিলেন না। ভোগী এবং চারিত্রিক দৃঢ়তাহীন অসংখ্য পুরুষ তাঁকে নিক্ষিপ্ত করেছিল সমাজনিপীড়িত অসহায় নারীজগতে; এবং নারীর নিকট থেকে চিরকাল সমবেদনা পেয়ে নারীর প্রতি তাঁর অন্তর শ্রদ্ধাপ্লুত হয়েছিল এ কথা তাঁর স্বরচিত অসমাপ্ত 'বিদ্যাসাগর চরিতে' তিনি স্বীকার করেছেন। পুরুষ এবং নারী সম্পর্কিত বিদ্যাসাগরী মনোভাবের এই অংশে চমৎকার অভিব্যক্তি ঘটেছে—

'পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয় বিদারণ উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রী-জাতির প্রতি তেমনি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক পুরুষ হইলে ঠাকুরদাসের উপর কখনই এরূপ দয়া প্রকাশ এবং বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না।'[৩৮]

সুতরাং নারীর মূক বেদনাকে ভাষা দিতে গিয়ে পুরুষ জাতির উপর ঔদাসীন্য প্রদর্শন নিতান্ত নিহে'তুক নয়। দুষ্মন্তচরিত্রের উপরও মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরের ঔদাস্য এ সত্যকে দীপিত করে তোলে।

নারী জাতির প্রতি বিদ্যাসাগর চরিত্রের আকর্ষণের মূলে আরও গভীর এবং গূঢ় কারণ নিহিত রয়েছে ব'লে মনে হয়। সুপ্রাচীনকালে বাংলদেশে হয়ত মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচালিত ছিল। আজও পূর্ব-পাকিস্তানের নিকট প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে নারী প্রধান্য প্রকট। আর্য-অনার্য মিশ্রিত জাতির রক্তে অস্ট্রিক-মোঙ্গল রক্ত মিশে এক বিচিত্র সংকর জাতির সৃষ্টি হয়। আর বাংলায় ইসলামের বাণী পৌঁছানোর পূর্ব পর্যন্ত মাতৃতন্ত্র প্রবল থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যার জন্যে হয়ত সংকর হিন্দু বাঙালীর ভিতর পূজ্যদেবতার চেয়ে পূজ্যদেবীর সংখ্যাধিক্য এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেবী এবং নারীর প্রাধান্য সূচিত। আরও আশ্চর্য — বিদ্যাসাগর-উত্তর হিন্দু-মুসলিম সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপ করলে এ সত্যই প্রতীয়মান হবে যে, সেখানে পুরুষ চরিত্র গৌণ; নারী চরিত্রের জয়জয়াকার সেখানে।

বিদ্যাসাগর সুপ্রাচীনকালের বাঙালী জাতির মানসাশ্রিত অলক্ষ্য মাতৃতান্ত্রিক রীতির হয়ত বশ্য ছিলেন। তাই তাঁর চিত্রিত নারী চরিত্রগুলির ঔজ্জ্বল্য চমকপ্রদ ; কিন্তু পুরুষ তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই 'শকুন্তলা'য় দুষ্মন্ত প্রায় নির্জীব কিন্তু শকুন্তলা প্রভমানা!

তৃতীয় অংকে রাজার আকস্মিক আগমনে বিরহ-সন্তপ্তা শকুন্তলা গাত্রোত্থান করতে চাইলে দুষ্মন্ত বলেন,

উৎসৃজ্য কুসুমশয়নং নলিনীদল কল্পিত স্তনাবরণম্,
কথমাতপে গমিষ্যসি পরিবাধা পেলবৈরঙ্গৈঃ॥[৫৯]

[বাংলা তর্জমা— নলিনী দল কম্পমান স্তনাবরণী এবং শীতল পুষ্পশয্যা ছেড়ে প্রখর রৌদ্রে মলিন দেহটি টেনে কেমন করে তুমি চলবে ?]

বিদ্যাসাগর এখানে সৃষ্টি-ভোর, মৌলিক সৃষ্টির দ্বার-প্রান্তিক তিনি। তাই তাঁর বর্জনাস্ত্র এখানেও নির্মম হয়ে অন্তরালোকের স্বকীয়ত্বে ছড়িয়ে পড়লেন—

'সুন্দরি, একি কর ; একে তোমার অবস্থা এই, তাহাতে আবার মধ্যাহ্নকাল অতি উত্তাপের সময় ; এ অবস্থায়, এ সময়ে লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হওয়া কোনও মতেই উচিত নয়।'[৬০]

উপমা বিদ্যাসাগর ছেড়েছেন, কিন্তু মূলভাবকে কি তিনি পীড়িত করেছেন ?

আমার ত মনে হয়, তিনি মূলভাবকে সুকৌশলে অধিকতর মনোজ্ঞতায় এবং স্বাভাবিকত্বের যাদুস্পর্শে নূতন সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

ইতিপূর্বে অবশ্য প্রিয়ংবদা, অনসূয়া মৃগীশাবক ধরবার ছলনা ক'রে শকুন্তলা এবং দুষ্মন্তকে বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই সুযোগ-সৃষ্টির কৌশল কালিদাস এবং বিদ্যাসাগরে কিছু ভিন্নতর। মাতৃসন্ধানী শিশু হরিণকে দেখে কালিদাসের প্রিয়ংবদাই কেবল বলেন—

'(সদৃষ্টিক্ষেপম্) অণসূএ জহ্ এসো ইদোদিণ ণ দিট্‌ঠী উসসুও মিঅপোদ-ও মাদরং অণ্ণেসদি। এহি সংজে এম নং।'[৬১]

[বাংলা তর্জমা— অনসূয়ে! দেখ, উদ্বেলাকুল হরিণ শিশু তার মাকে খুঁজে হয়রান হয়ে পড়েছে। এস, আমরা ওকে ওর মার কাছে দিয়ে আসি।]

অনসূয়া নীরবে প্রিয়ংবদার অনুগমন করলেন।

কিন্তু বিদ্যাসাগর বুদ্ধিমতী অনসূয়াকে বিনা বাক্যব্যয়ে প্রিয়ংবদার অনুগামিনী না করে তার মুখেও দিয়েছেন তাঁর যাত্রার কারণ ব্যাখ্যাসূচক বাক্য। প্রিয়ংবদা যখন বলেন, অনসূয়ে! মৃগশাবকটি উৎসুক হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে; বোধকরি, আপনার জননীর অন্বেষণ করিতেছে; আমি উহাকে উহার মার কাছে দিয়া আসি।'[৬২]

'তখন অনসূয়া কহিলেন, সখি! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী উহারে ধরিতে পারিবেনা; চল, আমিও যাই।'[৬৩] বিদ্যাসাগর অনসূয়ার মুখে এই চাতুর্য-পূর্ণ উক্তি দিয়ে আপনার মৌলিক প্রতিভার প্রকাশ করেছেন। অনসূয়ার চরিত্রদ্যুতি বিভাসিত ক'রে সমস্ত তপোবন রম্যতায় ভ'রে দিয়েছেন লেখক। এবং উভয় সখীর শকুন্তলা এবং দুষ্মন্তের প্রতি এই বাণী-চাতুর্যে, মধুরিম সৌন্দর্যে বিদ্যাসাগর মূলের সৌন্দর্য বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদার গমনের পর রাজা এবং শকুন্তলা প্রেমালাপের অখণ্ড সুযোগ পেলেন। শকুন্তলা নিজেকে একাকিনী বোধ করে প্রস্থানোদ্যত হ'লে দুষ্মন্ত প্রেয়সীর কোমল বাহুদুটি ধরে তাকে নিবৃত করলেন। শকুন্তলার শরীর কেঁপে উঠলো। নিজের অসহায়ত্বের কথা রাজাকে কম্পিতা শকুন্তলা কাতর কণ্ঠে জানালেন,

পৌরব, রক্‌খ বিনঅং। মঅণ সংতত্তাবিণ হু অত্তণো পহবামি।'[৬৪]

[বাংলা তর্জমা— হে পৌরব, বিনয় রাখুন। আপনি হয়ত একথা অবগত নন কিন্তু আমি আমার নিজের বশ নই।]

বিদ্যাসাগরে এই অংশে কালিদাসের অনুকৃতি বেশ চলছিল। বিদ্যাসাগরে শকুন্তলা রাজাকে বলছেন, 'তুমি জাননা, আমি আপনার বশ নই।'[৬৫] কালিদাস এবং বিদ্যাসাগর এখানে সমযাত্রিক। রাজা শকুন্তলার হাত ছেড়ে দিয়ে শরমিন্দা হয়ে পড়েছেন নিজের ব্যবহারের কথা ভেবে। বিদ্যাসাগর এবার কিন্তু ভিন্ন পথাবলম্বী হলেন। কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর মানস-দুহিতার সূক্ষ্মপার্থক্য চমৎকারিত্বে হৃদয় লুট করে নেয়।

রাজাকে অপ্রতিভ দেখে দুঃখিত শকুন্তলা বললেন,

'আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আমি আপনাকে কিছু বলিতেছি না, দৈবের তিরস্কার করিতেছি।' রাজা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার করিতেছ কেন? দৈবের অপরাধ কি?[৬৬]

এবার বিদ্যাসাগর স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। কালিদাসের জগতের সঙ্গে বাংলার পরিচিত লোক যেখানে মিলে গেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দৈবের তিরস্কার শতবার করিব; সে আশায় পরের অধীন করিয়া পরের গুণে মোহিত করে কেন?'[৬৭]

দৈবকে তিরস্কার করবার ভিতর দিয়ে যে, আত্মসমর্পণী মনোভাব সুকৌশলে ব্যক্ত হ'ল, তা কালিদাসে খুঁজলে মিলবেনা। একেই বলে শিল্পীর যাদু। শকুন্তলার চরিত্র মৌহূর্তিক বিদ্যুদ্বিভাসনে আমাদের নয়ন ধাঁধিয়ে দিয়ে যায়। অন্তরতল উৎসারিত ভাবস্রোত সুমিত ভাষার সখীত্বে ও শক্তির মাধুর্যে গোলাপ গন্ধের মত ছড়িয়ে প'ড়ে চৌদিক গন্ধে মোহিত ক'রে জানিয়ে গেল বিদ্যাসাগর শিল্পী। বিদ্যা-সাগর, বনানী এবং জীবন যন্ত্রের নবীন এবং প্রবীন প্রজাপতি।

তৃতীয় অংকে কালিদাস রাজা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে নির্জন শিলাতলে বসিয়ে যে দৃশ্যের অবতারণা করলেন, তা ভুবনসাহিত্যের শ্লাঘ্য চিত্র বলা চলে। কবির কল্পনাবেগ চিত্রময়তা, উপমার নৃত্য ধ্বনির গুঞ্জরণ মিলে সে এক উপভোগ্য উপবন সৃষ্টি করলেন। মদন চারিদিকে যখন হংসমিথুনের পাখা মেলে ফুলে ফুলে দিল সাড়া, পড়ন্ত সূর্যের ঝিকিমিকি আলোয় তখন দুষ্মন্ত শকুন্তলা প্রেমের গভীর তলদেশ স্পর্শ করবার স্বপ্নে ভোর! গুরুজন-শাসনভীতা শকুন্তলার উদ্বেগ চাঞ্চল্য নিরাবৃত

হ'ল দুষ্মন্তের আকর্ষণীর প্রেমনিবেদনে। কিন্তু রাজাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই যেন শকুন্তলা রাজার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বনান্তরালে আত্মগোপন করলেন। রাজার বিরহদশা কালিদাস এঁকেছেন কাম-অতৃপ্ত রাজার শেষ চেষ্টার ব্যর্থতার উপর ঝোঁক দিয়ে। দুষ্মন্তের বিরহী মনের করুণ খেদের ভিতর। 'শকুন্তলার মৃনাল বলয় ভূতলে পতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা উঠাইয়া লইলেন; এবং পরম সমাদরে বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্বক, কৃতার্থমন্য চিত্তে, শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তোমার মৃণালবলয়, অচেতন হইয়াও দুঃখিত ব্যক্তিকে আশ্বাসিত করিলেক, কিন্তু তুমি তাহা করিলে না।'

এখানে রাজার মুখে শেষ বাক্যটি কালিদাসের সৌন্দর্যকে লাখো গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। কালিদাসের কামোত্তপ্ত, জৈবপিপাসাতুর রাজার মনের উপর সূক্ষ্ম অনু-রাগীর এই মায়াবরণ নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরের সূক্ষ্মস্বাতন্ত্র্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। এখানে রাজার উপর সহৃদয় বিদ্যাসাগর চিত্ত শান্ত। দুষ্মন্ত স্রষ্টার করুণাস্পর্শে এখানে আমাদের কাছে সাড়া দিয়ে গেলেন, 'আমি আছি।'

কিন্তু কালিদাস তপোবনে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করলেন। 'শান্তরসাস্পদ' পবিত্র তপোলোকে এবার মদনগৃহের বাণাগুন ছড়িয়ে পড়লো। শকুন্তলা ফিরে এসেছেন তাঁর ফেলে যাওয়া মৃণাল বলয়ের জন্যে। মৃণাল-বলয় দুষ্মন্ত পরিয়ে দিতে চান তাঁর হাতে। রাজি হলেন শকুন্তলা। কিন্তু কালিদাস প্রতিটি রেখায়, প্রতিটি বর্ণে এখানে উষ্ণ, উদ্বেল এবং অভিভবকারী মিলনদৃশ্যে শিহরণ জাগালেন দু'টি প্রাণে। বলয় শতবার পরিয়ে দিয়েও আরাম আসেনা রাজার প্রাণে। ইতিমধ্যেই 'শকুন্তলা' 'আর্যপুত্র' বলে অর্থাৎ দুষ্মন্তকে স্বামী ব'লে স্বীকৃতি জানিয়ে পরম তৃপ্ত করলেন। কিন্তু শুধু কি এই? না, তা নয়। এত দিনকার 'আপনি' সম্ভাষণ এবার নেমে আসে 'তুমি' পর্যায়ে! প্রেমের সূত্রপাত কামে, প্রেমের বিকাশ কিন্তু কামের চেয়ে হৃদয়ের গভীর স্তরে। যেখানে হৃদয়ের নৈকট্য সেখানে 'আপনি' এত দূরত্বে কুলায় না। বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা তাই বলেন, 'আর্যপুত্র, সত্বর হও, সত্বর হও।'[৬৮]

যাই হোক, রাজা নানা ছলে বিলম্ব ক'রে অবশেষে মৃণাল বলয় ত পরিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও সাধ মেটে না। নানান ছলে মৃণাল-বলয় পরিয়ে দিয়ে শকুন্তলার চিবুক স্পর্শ করলেন। আর নয়নে রেণুপতনজনিত যন্ত্রণা দূর করে দিতে

প্রেয়সী শকুন্তলার চোখে ফুৎকার করতে লাগলেন দুষ্মন্ত। কালিদাস দুষ্মন্তের এই সময়কার মনের আগুন এভাবে ব্যক্ত করলেন,—

অপরিক্ষত কমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষটপদেন
অধরস্য পিপাসতা ময়াতে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যত রসোহস্য ॥[৬৯]

[বাংলা তর্জমা— মধুকর অস্পর্শিত কোমল কমলের মত হে সুন্দরি, তোমার অধর-সুধা পিয়াসী আমার উপর তুমি সদয় হও।]

বিদ্যাসাগর এবার এসেছেন এমন মুহূর্তে যেখানে কালিদাসের তপোবনে আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। কিন্তু স্থিতধী এবং সৌম্য ঋষির মত এগিয়ে এলেন লেখক চরম পরীক্ষা দেবার জন্যে। বিদ্যাসাগরের মানস-কন্যা শকুন্তলা এতক্ষণে সম্পূর্ণভাবে আপনাকে দুষ্মন্তের নিকট বিলিয়ে দিয়েছেন। লেখকের বিচিত্রগতি লেখনী কেমন অবিকম্প তা দেখা গেল—

"অনন্তর রাজা, শকুন্তলার চিবুকে ও মস্তকে হস্তপ্রদান করিয়া, তাঁহার মুখ কমল উত্তোলিত করিলেন। শকুন্তলা, শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া, রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন। রাজা, সুন্দরি ! শঙ্কা কি—এই বলিয়া, শকুন্তলার নয়নে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন।"[৭০] বিদ্যাসাগর নিঃসন্দেহে আপন কাহিনীর সীমা লঙ্ঘন করতে চান না ; তাঁর বর্ণনাময় অনুবাদে তিনি নাটকীয়তার পক্ষপাতী নন কদাচ। অথচ নিপুণ তুলিকায় দুষ্মন্ত শকুন্তলার হৃদয় বিনিময়ের এই আলাপন সংক্ষিপ্ত সুন্দরতায় ধরেছেন। 'শান্তরসাস্পদ' তপোবনভূমে এর চেয়ে অধিক হৃদয়-লুকোচুরির প্রকাশ বিদ্যাসাগর আর কোথাও করেছেন ব'লে আমাদের মনে হয় না।

বস্তুতপক্ষে মিলনের এই মুহূর্তে কালিদাস নাটকীয় কলাকৌশলের সুযোগ পরি-পূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং নাটকীয় ঘটনার উর্ধ্ব'শ্বাস গতিকে চরম পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। এখান থেকে ঘটনা সুস্পষ্ট দানা বাঁধলো ; দুই দূর-দিগন্তের এক আসমানে একাকার হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হ'ল। দু'টি হৃদয়ের সংগুপ্ত সুরভি পরস্পরের

আন্তরসংযোগে মহাসমুদ্রের স্বপ্ন দেখলো। তাই কালিদাস আপন শক্তিমত্তার চূড়ান্ত পর্যায়ে মর্ত্য পৃথিবীকে লোভন, মোহন এবং দুর্লভ করে দিলেন। অতঃপর এই মর্ত্য ভূমির অপরাহ্ণিক ম্লানাভা কেবল আমাদের বেদনাতুর করবে, এবং পৃথিবীকে তার পূর্ব রূপে খুঁজে পেতে আমাদের অনেক অশ্রুর মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

বিদ্যাসাগরও কালিদাসের পন্থানুসরণে সর্বদা মর্ত্যলোককে জীবন্তিক করতে আপ্রাণ প্রয়াসী। আপন বর্ণনার রাজ্যে তিনিও দৈহিক মিলনের লীলাভূমি করেছেন তপোবনকে, যেখানে বিপর্যয় শুরু হয়েছে শাশ্বত নীতির। তাই দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে অশ্রুর মূল্যে সে-তপোবন প্রকৃতিকে আবার নির্মল, শান্ত ও পূর্ববৎ করবার সাধনা করতে হয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে কৌতুক এবং রহস্য ও রসালাপের ভিতর দিয়ে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা মধু-মুহূর্ত যাপন করলেন। এদিকে ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে তপোবনে তোলপাড়। এ বুঝি তপোবন প্রকৃতির বুকে রীতি-ভঙ্গেরই বিরুদ্ধ, প্রতিবাদী তপোবনাত্মার বিদ্রোহ! হঠাৎ শোনা গেল চক্রবাক চক্রবাকীর সংকেত। শকুন্তলার অন্তর উঠলো কেঁপে! সংকেতের অর্থ অনুধাবন করতে পেরেছেন বলেই তাঁর মুখ বিবর্ণ এবং শঙ্কিত হয়ে গেল।

আর্যা গৌতমী শকুন্তলার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে এদিকেই আসছেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে এ অবস্থায় দেখলে নিশ্চিত ঘটবে সমূহ সর্বনাশ। তাই চকিতা ভীতা শকুন্তলা আকুল হয়ে রাজাকে অনুরোধ করলেন—

(সসংভ্রমম্, পোরব, অসংসঅং মম সরীর বুত্তন্তোবলম্ভস্স অজ্জা গোদমী ইদো এব্ব আঅচ্ছদি। দাব বিড়বন্তরিদো হোহি।'[৭১]

[বাংলা তর্জমা— (সসম্ভ্রমে) হে পৌরব, আর্যা গৌতমী আমার অসুখের খবর পেয়ে আমাকে দেখবার জন্য এদিকেই আসছেন। আপনি সত্বর লতা-বিতানের আড়ালে আত্মগোপন করুন।]

কালিদাসের ভীতাসন্ত্রস্তা শকুন্তলার ভাব বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। একটু বিস্তৃত হলেও বিদ্যাসাগরের শকুন্তলার উদ্বেগ এবং ব্যস্ততা বিশেষ লক্ষণীয়— 'শকুন্তলা সংকেত বুঝিতে পারিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ!

আমার পিতৃষ্বসা আর্যা গৌতমী, আমার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া, আমি কেমন আছি জানিতে আসিয়াছেন ; এই নিমিত্তই অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, চক্রবাক ও চক্রবাকীর ছলে, আমাদিগকে সাবধান করিতেছে।'[৭২]

এখানে 'আমার পিতৃস্বসা' বিদ্যাসাগরীয় উদ্ভাবন। আমাদের দেশে পিসি-ভাইঝি সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর এবং পূজনীয়া মাতৃস্থানীয়া পিতৃষ্বসার সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র-ও বটে। সম্মানীয়া এবং সম্পূজনীয়া পিসির উল্লেখ এবং পিসির প্রতি সমীহভাবে শকুন্তলা বাঙালীর মেয়ের মুখটি স্মরণ করিয়ে দেয়। পিসি-ভাইঝির ছবিটিতে আমাদের বাংলা দেশের বাতাবরণ অত্যন্ত রুচিকর, প্রীতিপ্রদ ও হৃদয়-বেদ্য হয়ে উঠেছে।

কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মানস-কন্যার পার্থক্য এখানে আমাদের দৃষ্টিকে বিস্মিত করে দেয়। কালিদাসের শকুন্তলার গায়ে গৌতমী শীতল কমণ্ডলুর পানি ছিটিয়ে দিয়ে শকুন্তলার শরীরোত্তাপ দূর করতে চেয়েছেন, নিঃসন্দেহে সে মূর্তি ভুলবার নয়। কিন্তু সেখানে শকুন্তলা একাকিনী কেনই বা এবং প্রিয়ংবদা, অনসূয়া কোথায় এ প্রশ্ন-ও উঠেনি। গৌতমীর জিজ্ঞাসার উত্তরে শকুন্তলার শান্ত জবাব—

'অজ্জে, অত্থি মে বিসেসো'[৭৩]

[বাংলা তর্জমা— আর্যা ! আমার অবস্থার বেশ উন্নিত হয়েছে]

কিন্তু নিস্তরঙ্গ বাঙালীর হৃদয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করলেন শিল্পী বিদ্যাসাগর। কণ্বের আশ্রমে গ্রামবাংলার পিসি-ভাইঝির বার্তালাপ মধুর চিত্রে আর একবার বাংলা দেশকে আধুনিক অন্তরে বিদ্যাসাগর জাগিয়ে দিলেন।

'শকুন্তলা কহিলেন, হাঁ পিসি। আজ বড় অসুখ হয়েছিল ; এখন ভাল আছি।'[৭৪]

এই উপভোগ্য অংশের অনুবাদের সঙ্গে কি কালিদাসের আসমান-জমিন ব্যবধান রচিত হয়নি ? অথচ মূল ভাবকে আশ্চর্য নৈপুণ্যে বিদ্যাসাগর মধুর থেকে মধুরতর ক'রে বাঙালীর নিকট পরিবেশন করেছেন। শকুন্তলার কাহিনী পুরাতন।

কিন্তু 'শকুন্তলা' বাঙালী-পাঠকের চিত্তে নবরূপে নবাস্বাদনে আজও আস্বাদ্য। শিল্পীর কোন গহন মনের সংরাগাপ্লুত শকুন্তলা বাঙালীর মেয়ে হয়েই তার রূপ-গুণ-কথায়, লাজ-প্রেম-ছলনায় আমাদের হৃদয় হরণ করে বলেই বিদ্যাসাগর আমাদের স্মরণ্য। কালিদাসের প্রাচীন প্রেম-উপাখ্যানকে আধুনিক মনের দোরে পৌঁছে দিয়েই বিদ্যা-সাগর আপনার শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যে অপরিম্লান।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কালিদাসের পার্থক্য এখানেই শেষ হয় না। যখন বিদ্যাসাগরের গৌতমী বলেন,—'এই অসুখ, তুমি একলা আছ বাছা, কেউ কাছে নাই। শকুন্তলা কহিলেন, না পিসি! আমি একলা ছিলাম না, অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা বরাবর আমার নিকটে ছিল; এই মাত্র কলসীতে জল আনতে গেল।'[৭৫]

কালিদাসের গৌতমী শকুন্তলাকে সেই অপরাহ্ণে নিয়ে যেতে চাইলেন তপোধন-দের পর্ণ-কুটীরে। কিন্তু তার পূর্বে বিদ্যাসাগর নিজের লেখনীর স্বাধীন গতিকে আর একবার মুক্তপক্ষ বিহারে মুক্তি দিলেন। কালিদাসে অনুক্ত বিদ্যাসাগরের আমদানিকৃত উপরোক্ত অংশে কালিদাসের সঙ্গে ব্যবধান কি দুস্তর বলে মনে হয় না?

কালিদাস 'মেঘদূতে' একবার বর্ষণাকাঙ্ক্ষী মেঘের দিকে চেয়ে-থাকা নীলশাটী বধূদের জল ভরনে যাওয়ার কথা বলেছেন বটে। কিন্তু 'অভিজ্ঞানং শকুন্তলমে' তার কোন শোভমানতা খুঁজে পাননি। অথচ নদীমাতৃক বাংলার স্মৃতিপূত বিদ্যা-সাগর মানস নদীতীরে জলকে চলার সে মিষ্ট ছবি ভুলবেন কেমন করে? তাই কালিদাসের অনুল্লিখিত অথচ আপনার বড় প্রিয় সেই মালিনী নদীর তীরে এবং 'জল ভরনে' চলার ছবি পুনরায় স্মরণ করলেন। স্রষ্টার হৃদয়াঞ্জন এবং কল্পনা-ভিব্যঞ্জনার মধুর স্বপ্নায়ন যে-কোন মহৎ শিল্পীর মহত্ত্বসূচক। বিদ্যাসাগর শিল্পীর স্বপ্নায়নে মধুর থেকে মধুরতর করে শকুন্তলার মুখচ্ছবিকে আমাদের নেত্রপথে আকর্ষণীয় করে দিয়ে গেলেন।

তৃতীয়াংকের যবনিকাপতনের ঠিক অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে কালিদাসের শকুন্তলায় চতুরিকা নাগরিকার ধর্ম আরোপিত এবং সে অংশের মাধুর্য মহাকবির দুর্লভ সৃষ্টির যাদুস্পর্শিত। গৌতমীকে অনুসরণ করবার প্রাক্কালে শকুন্তলা লতাবিতানের প্রতি প্রণতি জানিয়ে বলেন—

'লদাবলঅ সংদাবহারঅ আমন্তেমি তুমং ভূও বি পরিভো-অস.স। [৭৬]

[বাংলা তর্জমা— ওগো সন্তাপহারী লতামণ্ডপ! আবার তোমাকে উপভোগের আমন্ত্রণ জানাই।]

লতামণ্ডপের অন্তরালাশ্রয়ী রাজাকে এই বিচিত্র এবং অভিনব সম্বোধন এবং আমন্ত্রণ জ্ঞাপন চমকারিত্বে হৃদয়হারী।

কিন্তু বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা পিসির নিকট আনুগত্যভরাচিত্ত এবং নিজের 'ভাল-মানুষি'র জন্য লতামণ্ডপকে সম্বোধন করতে সাহস পাননি। তাই —

'শকুন্তলা অগত্যা তাহার অনুগামিনী হইলেন। [৭৭]

কালিদাসের অংকের ঠিক যবনিকাপাতমুহূর্তে আমরা আসন্নসন্ধ্যায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন-কারী তপোবনের বিহ্বল মুহূর্ত চাক্ষুষ করি। সেখানে কালিদাসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-কৌশল শ্লোকরত্নে সেই মুহূর্ত রূপায়িত করলেন—

সায়ংতনে সবন কর্ম্মণি সংপ্রবৃত্তে
বেদীং হুতাশন বতীং পরিতঃ প্রকীর্ণাঃ।
ছায়াশ্চরন্তি বহুধা ভয়মাদধানাঃ
সংধ্যাপয়োদকপিশাঃ পিশিতাশনানাম ॥ ২৬ ॥ [৭৭]

[বাংলা তর্জমা— সন্ধ্যাকালীন তপঃকার্যের অনুষ্ঠানাদি অগ্নিপূত দেবীর চারিদিকে লক্ষিত হচ্ছে। সান্ধ্য মেঘমালার মত লোহিতাভ অথচ শঙ্কিল পিশাচদের অশুভ ছায়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।]

বিদ্যাসাগর এই সান্ধ্য শঙ্কিল আবহাওয়ার চিত্র বর্জন করেছেন। 'তৃতীয় পরিচ্ছেদে'র উপসংহার কল্পনা তাঁর নিজস্ব। তিনি লিখলেন—

এইভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইল। পরিশেষে, গান্ধর্ববিধানে শকুন্তলার

পাণিগ্রহণ সমাধানপূর্বক, বর্যারণ্যে কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া, রাজা নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন।' [৭৯]

উপসংহারে বিদ্যাসাগর নিজস্ব কল্পনার এক অভিনব সংবাদ দিলেন। সেটি হল গান্ধর্ববিধানে দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলার পাণিগ্রহণ।' কালিদাসের তৃতীয় অঙ্কে গান্ধর্ব-রীতিতে বিবাহ দূষণীয় নয়, একথা রাজা শকুন্তলাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে বিবাহ করে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন কালিদাস এমন কিছু বলেননি। মহাকবির চতুর্থ অংকে অনসূয়ার মুখে শোনা যাবে, রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেছেন।

'হলা পিঅংবদে, জহ বি গন্ধবেণ বিবাহবিহিণা পিব্বুত্তকল্লাণা সউন্দলা অণুরূব-ভত্তুগামিণী সংবুত্তেতি পিব্বুদং মে হিঅঅং তহবি এত্তিঅং চিন্তনিজ্জং।' [৮০]

[বাংলা তর্জমা— সখি, প্রিয়ংবদা, যদিও গান্ধর্ববিবাহের ভিতর দিয়ে শকুন্তলা উপযুক্ত স্বামীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে বলে আমার মনে আনন্দের সীমা নেই, কিন্তু তবু সংশয় আমার মনকে খুব ভাবিয়ে তুলছে।]

অথচ বিদ্যাসাগর 'তৃতীয় পরিচ্ছেদে'র শেষে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ সংবাদ নিজে সৃষ্টি করেছেন। কালিদাসে যা অনুপস্থিত, বিদ্যাসাগরে তার সংযোজন। নাটকীয় ভঙ্গিতে ভয়ার্ত তপোবন প্রকৃতির সংবাদে কালিদাসের অংক সমাপ্তি; আর পরবর্তী ঘটনার সংকেতদানে বিদ্যাসাগরীয় উপাখ্যানের সমাপ্তি।

'তৃতীয় পরিচ্ছেদে'র সমাপ্তিতে আমাদের মন্তব্য এই যে, কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞানং শকুন্তলমে' নাটকের জগতে অপরাজেয় শিল্পী। বাংলাভাষার কর্ম-যোগী ভাষা-স্থপতির সঙ্গে তুলনায় নাট্যকার কালিদাসের গৌরবলাঘব সম্ভাবনা জাগে। কিন্তু বিদ্যাসাগর কবি বা নাট্যকার না হলেও তাঁর ছিল কালিদাসের সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তি, অন্যদিকে ছিল করুণাকর অন্তর। এবং কালিদাসের সঙ্গে গভীর পরিচয় জনিত আবেগ ও সমকালীন সমাজ নিষ্পেষিত নারীর মৌনবেদনার আঘাতকম্পিত বিদ্যাসাগর মানসের বহিঃ প্রকাশ তাঁর 'শকুন্তলায়'। কালিদাসের মর্যাদা লঙ্ঘন না করে বঙ্গীয় রূপান্তরণে বিদ্যাসাগর বরং কালিদাসের দেশকালজয়ী মর্যাদাকে বঙ্গীয়

গৃহাঙ্গণে ছড়িয়ে দিলেন। আর এই বাংলার নারীর বেদনায় এবং বাংলার মানস-পরিমণ্ডলে কালিদাসকে পরিচায়িত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর স্বকীয়তায় দেদীপ্যমান। কালিদাসের বিশ্বস্মরেণ্য নাটক 'অভিজ্ঞানং শকুন্তলমে'র খ্যাতি বিশ্বময়; কিন্তু বিদ্যা-সাগরের 'শকুন্তলা'ও বাংলা সাহিত্যের এক বিশ্রুত, স্মরণ্য এবং অপরিহার্য গ্রন্থ।